আকিমুন রহমান

বিবি থেকে বেগম

বাঙালি মুসলমান নারীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস

সূ চি প ত্র

প্রকাশকের কথা

'পশ্চিমবাংলার প্রতি চারজন মানুষের একজন মুসলমান'— বলা মাত্র ভুরু কুঁচকে কোনও সেকুলার মানুষ বলতে পারেন, তার মানে আপনি হিন্দু হয়ে কথা বলছেন? কিন্তু যে মুহূর্তে প্রথম উক্তির শেষ অংশ হিসেবে 'এবং বাকি প্রায় তিনজন হিন্দু' বলা হল সেই মুহূর্তেই বক্তা না-হিন্দু এবং না-মুসলমান অর্থাৎ এক সাধারণ নাগরিকে পরিণত হলেন। এ-রকম এক সাধারণ মানুষ হয়েই যখন গ্রামগঞ্জে ঘুরতে যাই তখন বিশেষ এক অংশের দারিদ্র, অশিক্ষা, বেকারত্ব এবং সার্বিকভাবে তাদের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য চোখে লাগে। ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা ধরলে তাঁরা মুসলমান। পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে, এখানকার রাজনীতি, সরকার পরিচালনা, শিল্প বা সাহিত্যে এই সমাজের অংশগ্রহণ প্রায় অনুপস্থিত। যে কোনও সমাজের এগিয়ে থাকা বা পিছিয়ে থাকার প্রমাণের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে তো সেই সমাজে নারীর অবস্থানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক। মুসলমান সমাজে নারীর ভূমিকা তাই এই সমাজকে জানা বা বোঝার পক্ষে জরুরি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের যে পশ্চিমবাংলার কোনও লেখক বা গবেষক বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থানের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। আকিমুন রহমান ওপার বাংলার। উনিশ-বিশ শতকের হিন্দু বাঙালির তথাকথিত এনলাইটমেন্টের যুগে পাশাপাশি বাস করা মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত চেতনায় কীভাবে তার ছাপ পড়ছে আর তার প্রভাবে মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজে নারী কীভাবে বিবি থেকে বেগমে পরিণত হচ্ছেন— এটাই বুঝতে চেয়েছেন আকিমুন।

কিন্তু বুঝতে চেয়েছেন গত শতকে নতুন মধ্যবিত্ত মুসলিম পুরুষ বুদ্ধিজীবীদের তৈরি করা রাস্তায় নয়, আকিমুন রহমানের রাস্তা বিজ্ঞানের। প্রচলিত মত ও পথগুলিকে শুধু শুধু সন্দেহ না করে, সন্দেহ করার মতো কারণগুলিকে আগে চিহ্নিত করেছেন। আবেগ নয়, বলা যায় এক বিজ্ঞানীর অবজেক্টিভিটি দিয়েই গত শতকের মুসলিম নারীর রূপ পরিবর্তনকে ধরতে চেয়েছেন তিনি। এবং সার্থকভাবেই ধরেছেন। আশা করি ওপার বাংলার মানুষের মতো এপার বাংলার বিদগ্ধ এবং বাংলার সমাজ-ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠকের কাছে বইটি অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই বাঙালি মুসলমান সমাজের ছোটো একটি অংশে জেগে উঠেছিলো ভিন্ন রকম এক ক্ষুধা– ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষুধা : 'ইংরেজি ভাষার শান্তি প্রদায়িনী ছায়ায় না আসিলে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইবে'– এর সঙ্গে আরো ছিলো সমাজে সম্পন্ন, মান্যগণ্য একজন হয়ে প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষুধা; ছিলো নতুন রকমের এক জীবনসঙ্গিনী পাবার ক্ষুধা। কেমন হতে পারে ওই নতুন রকমের জীবনসঙ্গিনীর বৈশিষ্ট্য– এই ভাবনাও ব্যাকুল করছিলো তাদের। ওই ব্যাকুলতাতাড়িত বাঙালি মুসলমানের সামনে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই তুলে ধরা হয় এক অভিনব নারী ভাবমূর্তি– যা ওই অল্পশিক্ষিত চিত্তলোককে করে গভীর অভিভূত। এই নারী ভাবমূর্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস। বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যমূল্যশূন্য এ উপন্যাসগুলোতে তৈরি করা হয় অল্প লেখাপড়া জানা, অতি রূপবতী, পর্দানশীল, ধর্মপরায়ণা, পতি অনুগতা পত্নীর ছাঁচ। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য রত্নের আনোয়ারা (১৯১৪); গরীবের মেয়ে (১৯২৩); মৌলভী আবদুল ফাত্তাহ কোরেশীর সালেহা (১৯২৪); মৌলভী কোরবান আলীর মনোয়ারা (১৯৩২) প্রভৃতি উপন্যাসে যে নতুন নারীভাবমূর্তি তৈরি করা হয়, তারই ছাঁচে ক্রমশ বাস্তবে বিবিকুল তৈরি হতে থাকে। অল্প লেখাপড়া জানা বাঙালি মুসলমান সমাজে বিয়ের পর পরই নববিবাহিতা নারীর হাতে ওইসব উপন্যাসের যে কোনো একটি তুলে দেয়া একটি প্রথায় পরিণত হয়; এবং এ প্রথাটি দীর্ঘদিন ধরে পালিত হয়ে এসেছে। নববিবাহিত স্বামী নবপরিণীতার হাতে এসব উপন্যাসের যে কোনোটি তুলে দিয়েছে এজন্য যে, যাতে নায়িকার সদগুণাবলী বাস্ত ব জীবনে অনুসরণ করে করে নতুন বধূটি। হয়ে উঠতে পারে ওই ছাঁচ মাফিক।

ক্রমশ বাঙালি মুসলমান পুরুষ উপন্যাসের নারী ভাবমূর্তির ছাঁচ অনুসরণ করার সাথে সাথে নিজেরাও বাস্তবে নিজেদের শিক্ষা রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী প্রস্তুত করে নানারকম নতুন ছাঁচ নারীদের জন্য; আর বাস্তব নারীদের ওই ছাঁচ মতো গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়। দশকে দশকে এই ছাঁচ হয়েছে ভিন্ন, ভেঙেচুরে বদলে তৈরি

হয়েছে নতুন ছাঁচ। পুরুষের তৈরি করে দেয়া নারী ভাবমূর্তির ছাঁচে গড়ে উঠেছে নতুন নারী– নিয়ন্ত্রিত, বদ্ধমনা ও অথর্ব। ছাঁচ মাফিক তৈরি করার সে ব্যবস্থা নতুন রূপে এই বর্তমানেও রয়েছে সচল।

'বিবি থেকে বেগম– বাঙালি মুসলমান নারীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস' বইয়ে নির্দেশ করা হয়েছে বাঙালি মুসলমান নারীর বিবর্তনের রূপ। বরং বলা ভালো, দেখানো হয়েছে পুরুষপ্রস্তুত কতোরকম ছাঁচের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে ওই নারী। দেখানো হয়েছে ছাঁচমতো তৈরি হবার গোড়া থেকে বর্তমান পর্যন্ত কীভাবে তাকে যাপন করতে হয়েছে বিকলাঙ্গ শৃঙ্খলিত দাসীর জীবন।

এ বইটিকে সহ্য করতে হয়েছে নানা বিপত্তির পীড়ন ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশের সময় থেকে। পাক্ষিক শৈলী পত্রিকায় 'বিবি থেকে বেগম' যখন ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিলো, বাংলাদেশের ছাপ্পান্নো জন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, এর ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে, এবং তারা সমর্থ হন। এবং চিন্তার কণ্ঠস্বর রোধ করার গৌরব অর্জন করেন তাঁরা। বইটির ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

বইটির পরিবর্তিত সংস্করণ বেরোয় অঙ্কুর প্রকাশনী, বাংলাদেশ থেকে। এখন গাঙচিল কলকাতা একে প্রকাশের জন্য এগিয়ে এসে এই সত্য গভীরতর করে তুলেছেন যে, চিন্তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার শক্তি সংঘবদ্ধ হলেও, মুক্তকণ্ঠ চিন্তার পক্ষেও আছে অনেক অনেক প্রাণ–

ধন্যবাদ গাঙচিল
আকিমুন রহমান

জ্ঞানপ্রাপ্ত আদম : তার নতুন ক্ষুধা

বাঙালি মুসলমান সমাজে বিশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা দেয় একটি নতুন গোত্র; ঐ গোত্রটি সমাজের বড়ো অংশের থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাদের চাহিদা ভিন্ন; ভাবনা ও জীবনযাপনের ধরন ভিন্ন, অবস্থাও ভিন্ন। তারা ভিন্ন, কারণ তারা 'জ্ঞানপ্রাপ্ত'। তাদের জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে ওঠার পেছনে হাওয়ার কুমন্ত্রণা ছিলো না, দিব্য জ্ঞানফলের ভূমিকা ছিলো না, কোনো শয়তানের প্ররোচনা ছিলো না। জ্ঞানপ্রাপ্ত এই নতুন আদমকে তৈরি করেছে সমাজ, সমাজের একটি অংশের ব্যাকুলতা সম্ভব করে তোলে 'নব্য আদমের' আবির্ভাব। বাঙালি মুসলমান সমাজের ক্ষুদ্র সচেতন অংশটি সমাজের অসচেতন বড়ো অংশের কাছে এই নব্য আদমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে, তার স্তব করে, বিরোধীদের ধিক্কার দিয়ে সকল অপযুক্তি খণ্ডন করে সুগম করে তোলে তার আবির্ভাবের পথ। তারা চায় এই নব্য আদম হবে ইংরেজি শিক্ষিত, কর্মজীবনে 'উন্নতি' ও 'উচ্চাসন' লাভে যোগ্যতাসম্পন্ন। তার সমকালের বাঙালি হিন্দুর মতো সেও কর্মজীবনে 'উচ্চাসন' লাভ করবে ইংরেজি শিক্ষিত হয়ে। তবে আবির্ভাবকালেই বাঙালি হিন্দুর মতো 'উচ্চাসন' লাভ করার যোগ্যতা ও উচ্চাভিলাষ নব্য আদমের ছিলো না। সর্বোচ্চ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্য তার ছিলো না; কিংবা তা অর্জনের অভিলাষও তার ছিলো না। উঁচু পদে আসীন হওয়ার উচ্চাভিলাষও এ-সময় তাকে তাড়িয়ে ফেরে নি। এগুলো এ-সময় তার ভাবনারই বিষয় ছিলো না। সে তুষ্ট ছিলো তার সামান্য শিক্ষায় এবং সামান্য পেশায়; কিন্তু মোটেও সন্তুষ্ট ছিলো না বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন নিয়ে। ইংরেজি শিক্ষার আলোক তাকে জ্ঞানপ্রাপ্ত করে, সে তাকায় তখন নিজস্ব জীবনবৃত্তে। কর্মজীবনের সাফল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উচ্চশিক্ষা ও উচ্চাসন লাভের স্বপ্ন-বাসনা-প্রয়োজনীয়তা তখন তার কাছে বড়ো হয়ে আসে নি, এ-ব্যাপারগুলোকে বড়ো করে দেখার মতো শক্তি-যোগ্যতা- সাহস-প্রেক্ষাপট তার ছিলো না। সে বোধ করে অভিনব এক ক্ষুধা; যা তার পূর্বপুষের ছিলো না, যে ক্ষুধা তার নিজস্ব এবং নতুন, একান্তভাবে তার প্রজন্মের ক্ষুধা। সে নিজের জন্যে চায়

এক নতুন নারী, যে তার জননীর মতো নয়, পিতামহীর মতো নয়; যে তাদের থেকে ভিন্ন ও নতুন। ওই নারী নতুন সময়ে শুধুমাত্র তার জন্যে সৃষ্ট : ভিন্ন এবং মনমতো। ভিন্ন রকম জীবনযাপনের ক্ষুধা সে বোধ করে; যে জীবনযাপন পদ্ধতি তার পিতার জীবনযাপন পদ্ধতির মতো নয়, যে জীবনযাপন পদ্ধতি তার পিতামহের জীবনযাপনের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এ-ক্ষুধাই হয়ে ওঠে মুসলমান নব্য আদমের জীবনের বড়ো ব্যাপার, যা মেটাবার জন্যে তৎপর হতে হয় তার নিজেকেই। আদি আদমের চিত্তে নিঃসঙ্গতাবোধ জেগে ওঠার আগেই তার প্রভু তাকে তৈরি করে দিয়েছিলো অনুগতা বশীভূতা হাওয়াকে; বাঙালি মুসলমান নব্য আদমের জন্যে এমন মনমতো নিজস্ব হাওয়া উপহার দেবার কেউ ছিলো না। তার বিবি তাকে নিজেকে গড়ে নিতে হয়েছে; তার নিজের বিশ্বাস-কামনা ও শক্তি দিয়ে সে গড়েছে তার বিবিকে। দূর করতে হয়েছে নিঃসঙ্গতার ভার।

নব্য আদম ইংরেজি শিক্ষিত, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত নয়। এরা ইংরেজ শাসকের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত ও বিদ্যালয়ে কাজ করলেও কেউই উচ্চপদে আসীন নয়। সমকালের মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুদের তুলনায় তারা অনেক পশ্চাদপদ ও নিম্ন সাংস্কৃতিকমানসম্পন্ন। এদের পূর্বপুরুষ সাধারণত নিরক্ষর কৃষিজীবী এবং দরিদ্র। এদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি সাধারণত গ্রাজুয়েশন, নগণ্য সংখ্যক আইন পড়েছে। এদের বড়ো অংশ ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ অথবা এফ. এ ফেল। এদের কেউ পাটের অফিসের বড়োবাবু, কেউ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাস্টার, কেউ সওদাগরি অফিসের কেরানি, কেউ স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে গুটিকয় মাত্র পেশার প্রয়োজনে এসে পৌঁছে কলকাতা নগরীতে, অধিকাংশই কর্মজীবন যাপন করে গ্রামের আবহাওয়া জড়ানো মফস্বলগুলোতে এবং সেখানেই তারা স্বস্তি ও তৃপ্তি পায়। এরা সমকালীন বাঙালি মুসলমানের বড়ো অংশের চেয়ে ভিন্ন, কারণ তারা পেয়েছে ইংরেজি শিক্ষার স্পর্শ। তবে এ শিক্ষা ছিলো তাদের একান্ত 'বৈষয়িক উন্নতি' লাভের মাধ্যম মাত্র, অন্যকিছু নয়। ইংরেজি শিক্ষা তাদের মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন করে তোলেনি, তাদের চেতনার জাগরণ ঘটায় নি, বরং ইংরেজি শিক্ষিত নব্য আদম ধর্মীয় বিধিবিধানের নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং অতি শাস্ত্রশাসিত একটি গোত্র। সমকালীন ও পূর্ববর্তী অজ্ঞ সাধারণদের চেয়ে তারা অনেক বেশি ধর্ম সচেতন, ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে সজ্ঞান এবং জীবনের সকল পর্যায়ে ওইসব বিধিবিধানের কঠোর প্রয়োগের পক্ষপাতী। তারা ইংরেজি শিক্ষিত নতুন ধর্মসচেতন বাঙালি মুসলমান, যাদের মন ভরে আছে ধর্মীয় অন্ধকারে; কিন্তু এটুকু বোধোদয় তখন তাদের হয়েছে যে, 'এ যুগ বেশির ভাগ ইংরেজির, ইংরেজি না শিখিলে আর মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই; 'ইংরেজি ভাষার শান্তি প্রদায়িনী ছায়ায় না আসিলে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।'

এরা চাকুরির কারণে শহর ও মফস্বলগুলোতে ছড়িয়ে পড়লেও, ওই চাকুরিস্থল বরাবরই তাদের কাছে থেকেছে অনাত্মীয় প্রবাস হিসেবে। গ্রাম বা পৈতৃক ভিটা তাদের প্রকৃত ঠিকানা। কর্মস্থলে তারা বাস করে অস্বস্তিতে, আগন্তুকের মতো; যেকোনো ফাঁক পেলেই ছোটে গ্রামে– সেখানে সে পায় স্বস্তি। গ্রামে শক্তপোক্ত করে দালানকোঠা কিংবা মজবুত ঘর বানায়, জমি-জিরেত বাড়ায়, স্ত্রীটিও তারা যোগাড় করে গ্রাম থেকে এবং তাকে গ্রামে রেখেই সে কর্মস্থলে যায়। গ্রামেই তাদের প্রতিপত্তি, বিত্ত বৈভব প্রদর্শনের জায়গা এবং গ্রামে আর দশজনের কাছে মান্যগণ্য হয়ে ওঠাই তাদের পরম পাওয়া। এদিক থেকে পূর্বপুরুষদের মতো বা সমাজের বড়ো অংশটির মতো গ্রামই তাদের প্রধান অবলম্বন; কিন্তু ওই গ্রামে সে নিজের শয্যায় এবং সংসারে যে বিবিকে চায় ওই বিবি পূর্বপুরুষদের পত্নীদের মতো কেউ নয়। যে গৃহস্থালী সে চায়, তাও ভিন্ন। এরা চায় সুশৃঙ্খল পরিপাটি গৃহস্থালী এবং উন্নতজাতের বিবি, যারা পিতামহী মাতা ও অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওই বিবিদের থাকবে নানা গুণ। তারা হবে রূপসীর অধিক রূপসী, বেহেশতের হুরীর মানবী রূপ; কিন্তু তারা অবশ্যই হবে ঘোরতর পর্দানশীন, তারা লেখাপড়া জানবে; কোরান-হাদিস যেমন অবলীলায় পড়তে জানবে তারা, তেমনি অবলীলায় পড়তে পারবে বাংলা ও ইংরেজি, নানারকম নীতিশিক্ষামূলক পদ্য থাকবে তাদের কণ্ঠস্থ, তারা জানবে অঙ্ক, জানবে উত্তম সূচিকর্ম, জানবে গৃহস্থালীর কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে, এমনকী প্রবাসী স্বামীকে মনমতো চিঠি লিখে তৃপ্ত করার যোগ্যতাও রাখবে তারা।

বাঙালি হিন্দু 'উন্নতজাতের স্ত্রী' উৎপাদনের তৎপর হয় উনিশ শতকে, আর নব্য জ্ঞানপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলমান- যাদের অভিহিত করেছি 'জ্ঞানপ্রাপ্ত নব্য আদম' নামে- উন্নতজাতের স্ত্রী উৎপাদনের তাগিদ বোধ করে আরো একশো বছর পরে। এর আগে তার নিজের জীবন এবং চেতনালোকই ছিলো ঘোর অন্ধকারে ঢাকা, নিজের সম্পর্কেই সে ছিলো অজ্ঞান, নিজের ক্ষুধাও তাই তখন ছিলো তার অজানা। এমন ক্ষুধা যে থাকতে পারে এ- ধারণাই তখন তার ছিলো না। যখন সে পেলো যৎসামান্য আলোর পরশ- সে আলো তাকে উদ্ভাসিত করলো সামান্য, কিন্তু সে জানলো তার চাহিদা; আর জানলো যে ওই চাহিদা বা ক্ষুধা মেটাবার উপায় তাকে নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। তবে উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে এই নব্য আদমের ভিন্নতা খুবই বেশি। ওই বাঙালি হিন্দু ছিলো উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদে আসীন, অনেকেই বিলেত ফেরত, সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত। তারা নিরক্ষর পিতামহীর সঙ্গে জীবন কাটাতে সুখ বোধ করে নি– তাই তারা সক্রিয় হয় উন্নতজাতের স্ত্রী উৎপাদনে। তাদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তৈরি করতে থাকে নতুন বাঙালি নারী। তারা বিদ্যালয়,

মহাবিদ্যালয় উত্তীর্ণ, সূচিকর্মে পারদর্শী, পিয়ানো বাজাতে দক্ষ, কেউ কেউ ফরাশি ভাষা জানার যোগ্যতাসম্পন্নও। তারা উচ্চশিক্ষিত বিদগ্ধ স্বামীর সঙ্গে রাতভরে বাখ বিটোফেন নিয়ে তর্ক করে, খোলা গাড়িতে স্বামীর পাশে বসে হাওয়া খায়, স্বামীর সঙ্গে ইংরেজের পার্টিতে যায়।

মুসলমান নব্য আদমের শিক্ষা ও পদমর্যাদা অতো উচ্চমানের ছিলো না, এদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ছিলো বি. এ; পেশাগত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ছিলো সাধারণ শিক্ষক থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হওয়া, কিংবা সওদাগরি অফিসে সামান্য পদ থেকে বড়বাবু পদে পদোন্নতি পাওয়া। এদের কাছেও অসহ্য মনে হয় নিরক্ষর পিতামহীর সঙ্গ, এদের চিত্তেও ক্ষুধা জেগে ওঠে নতুন ধরনের জীবনসঙ্গিনী পাবার। তবে ওই কাম্যাকে তাদের জন্যে সরবরাহ করার কেউ ছিলো না। পরিবারগুলো ওই চাহিদা বোঝার ও মেটাবার মতো বোধসম্পন্ন ছিলো না। ফলে নিজের সঙ্গিনী তাকে নিজেকেই তৈরি করে নেওয়ার উদ্যোগ নিতে হয়। এই গড়ার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কয়েকটি বাঙলা উপন্যাস। এ- উপন্যাসগুলোর রচয়িতা নব্য জ্ঞানপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলমান লেখক, যাঁদের আমরা নব্য আদমের সৃষ্টিশীল অংশ বলে গণ্য করতে পারি। এ-শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়া থেকে তাঁদের হাতে রচিত হতে থাকে নায়িকাপ্রধান উপন্যাসগুলো; যাতে প্রবলভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে নব্য আদমের ক্ষুধা ও সাধ। এ-উপন্যাসগুলো পালন করে দুটি ভূমিকা; নব্য আদমের সামনে এ-উপন্যাসগুলো তুলে ধরে তার কাম্যাকে, এই নারী বিবি রহিমার ছাঁচে তৈরি, বাঙালি বিবি রহিমা, বাঙালি সমাজে যে অভূতপূর্ব ও অভিনব : আনোয়ারা, নূরী, সালেহা, মনোয়ারা প্রভৃতি নামে তাকে ডাকা হয়। যে নামও ওই সময়ের বাঙালি মুসলমান কন্যার জন্যে নতুন, ওই নায়িকাদের নাম বিভিন্ন কিন্তু বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। তারা প্রত্যেকেই দূর মধ্যপ্রাচ্যের দূর অতীতকালের অসামান্য মর্ষকামী নারী বিবি রহিমার বঙ্গীয় সংস্করণ। তাদের নাম যাই হোক না কেনো তাদের পরিচয় একটিই- তারা বাঙালি নব্য বিবি রহিমা। এ– উপন্যাসগুলো নব্য বিবি রহিমার গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে পালন করে নব্য বিবি রহিমা তৈরি করার দায়িত্ব। এগুলো জোরেসোরে প্রচার করে চলে নব্য বিবি রহিমা হয়ে ওঠার ফজিলত। কি করে ওই রকম হয়ে ওঠা সম্ভব সে সম্পর্কে দেয় নানারকম নির্দেশ উপদেশ।

এ- উপন্যাসগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের আনোয়ারা (১৯১৪); গরীবের মেয়ে (১৯২৩); মৌলভী আবদুল ফাত্তাহ কোরেশীর সালেহা (১৯২৪); মোহাম্মদ কোরবান আলীর মনোয়ারা (১৯৩২)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসগুলো বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। অল্প সময়ের মধ্যে এক একটি সংস্করণ ফুরিয়ে যায় এবং নতুন সংস্করণ ছাপা হতে থাকে। এবং এখনও এগুলোর

পুনর্মুদ্রণ অব্যাহতই আছে। এ- রচনাগুলোর সাহিত্যমূল্য শূন্য; কিন্তু এগুলো মূল্যবান এ-কারণে যে, এগুলোতে মুদ্রিত হয়ে আছে একটি বিশেষ সময়ের বাঙালি মুসলমানের ক্ষুধা-জাগরণ-চাহিদার পরিচয়। এ-উপন্যাসের নায়িকারা নব্য আদমের চাহিদামতো প্রস্তুত। তারা রূপবতী, পর্দানশীন, পরহেজগার এবং লেখাপড়া জানা। তবে তারা কেউ ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ নয়। তারা গ্রামের পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শেখে এবং কাম্য বিবি এটুকু লেখাপড়া জানলেই মুসলমান নব্য আদম পরিতুষ্ট ও গর্ব বোধ করে। ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ কোনো বিবির স্বপ্ন নব্য আদম দেখে নি, দেখার সাহস ও শক্তি তার ছিলো না। কেন না সে নিজেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, হাতে গোনা ক'জন মাত্র গ্রাজুয়েট। এ-উপন্যাসগুলোর লেখকেরা কেউ স্কুলশিক্ষক, ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ; কেউ পোস্ট অফিসের কর্মচারী, বি এ. পাশ। তাঁদের মানসসুন্দরী তাই কোনোক্রমেই ছাত্রবৃত্তি পাশের অধিক কোনো পাশ দেবার অধিকার রাখে না। এ-উপন্যাসগুলোতে নারীদের প্রতি পুরুষতন্ত্রের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে। এই লেখকদের চোখে নারী ঘৃণ্য , নারী সকল অহিত ও অনিষ্টের মূল, কুচক্রী, অসৎ ও মহাক্ষতিকর। অকপটে নারীবিদ্বেষ জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ-রচনাগুলো প্রচার করে নতুন নারী ভাবমূর্তি বা আদর্শ বিবি হয়ে ওঠার একরাশ ছক। ওই ছকমানা, বশমানা নব্য আদম তথা পুরুষতন্ত্রের মনমতো হয়ে গড়ে ওঠা বিবিদের স্তুতিতে মুখর এ-উপন্যাসগুলো।

'যেরূপে পারি লেখাপড়া জানা পাত্রী বিবাহ করিবই'

মুসলমান নব্য আদমের লেখাপড়া জানা পাত্রীর প্রয়োজন পড়ে নিজের অহংকে তুষ্ট করার জন্যে। সে মাতা ও মাতামহীর মতো নিরক্ষর রূপসী কন্যার পাণিগ্রহণে অরুচি বোধ করে এ জন্যে যে, ওই নারী বেয়াড়া, রূঢ়ভাষিণী, বেয়াদব, কর্কশ ও নিজের ইচ্ছেমতো চলতে এবং সংসারধর্ম পালন করতে চায়। পুরুষের সকল সদুপদেশ ওই নারীদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। ওই নারী সংশোধিত ও মনমতো বিবি হয়ে ওঠে না কখনোই। সে দাসী কিন্তু অবাধ্য দাসী, তাই সে অপ্রিয়। নব্য আদম সমস্যা দেখেছে তার পিতার জীবনে, পিতামহের জীবনে চারপাশের আত্মীয়-স্বজনের জীবনে। কখনো তাদের কারো কারো জীবনেও ঘটে এমন ঘটনা। সে অনুমান করে ওই নারী অবাধ্য কারণ সে নিরক্ষর। লেখাপড়ার সংস্পর্শে সে আসে নি বলেই পতি নামক পরম গুরুর সকল সদুপদেশ সে পদদলিত করে এবং পতির চিত্ত বিষিয়ে তোলে। নব্য আদম তাই লেখাপড়া জানা পাত্রী বিয়ে করার জন্যে হয়ে ওঠে মরিয়া এবং বদ্ধপরিকর। সে চায় নবীন দীক্ষিত দাসী, স্বল্প লেখাপড়া জানা বিনীত ও সমর্পিত। লেখাপড়া জানা পাত্রী ওই শিক্ষার সাহায্যে জানতে পারে ধর্মীয় পতিব্রতাদের আত্মবিলোপের কাহিনী, সতীত্বের মহিমা ও পতিসেবার পুণ্য। পতি বা পুরুষতন্ত্রের পক্ষে এদের ইচ্ছেমতো শিক্ষা দিয়ে মনমতো আকার দেয়া হয়ে ওঠে সহজ। কিন্তু নিরক্ষরকে মহাশাস্ত্রবচন ও পতিসেবার মাহাত্ম্য যতোই শোনানো হোক– সে কোনো কিছুতেই কর্ণপাত করে না– কারণ তার হৃদয়ে কোনো মহৎ উপদেশ ধারণের ইচ্ছে বা শক্তি নেই। সে আয়েসী, কর্মবিমুখ, আয়াসপ্রিয়; তাই নব্য আদমের মনে জাগে তার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। সে চায় অক্লান্ত বাঁদী। নব্য বিবিকে সে ওইরূপেই গড়তে চায়। নব্য বিবি নব্য আদমের ইচ্ছে পূরণের সামগ্রীমাত্র। এই মনমতো, অক্রিয় স্বস্তিকর লেখাপড়া জানা পুতুল গড়ে তোলার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো নব্য আদমের সকলেই। এ-শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের জন্যে সক্রিয় হন অনেকেই। সমকালীন তুর্কী নারীদের আদর্শে ওই নব্য আদমেরা যেমন তাদের পুতুল গড়ে তুলতে চেয়েছেন; তেমনি তারা দূর অতীতের বিবি খাদিজা, বিবি ফাতেমা, বিবি

রহিমার জীবনাদর্শে সমকালের বাঙালি মুসলমান মেয়েদের জীবন গঠনের কথাও বলেছেন। ওই ব্যাকুল নব্য আদমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল করিম প্রমুখ। তবে যে সব নারীর ছাঁচে তাঁরা তাঁদের সংসারের মেয়েদের গড়তে চেয়েছেন- তারা প্রসদ্ধি জ্ঞানানুশীলন কিংবা বীরত্বের কারণে নয়। তারা প্রসিদ্ধ পতিসেবা, সতীত্ব, দুঃসহ দুঃখভোগ, অপার সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কঠোর মর্ষকামিতার জন্যে।

এই মর্ষকামিতা পুরুষতন্ত্র নারীদের মধ্যে দেখতে চায় এবং না দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। উপন্যাসগুলোর মধ্য দিয়ে নারীর প্রকৃত জাগরণের জন্যে লেখকেরা তৎপর হন নি; তা ঘটানোর অভিপ্রায়ও তাঁদের ছিলো না। এ-সব রচনায় তাঁরা নারীকে নতুনভাবে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন নিজেদের মনমতো বিধিবিধান দিয়ে। ওই সময়ের নিরক্ষর সাধারণ বাঙালি নারী ওইসব বিধিবিধানের তোয়াক্কা করে নি, যদিও তারা যাপন করেছে দাসীরই জীবন, তবে তারা মূক দাসী ছিলো না, ছিলো কলহপরায়ণ দাসী। মর্ষকামিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে ওঠে নি তাদের একেকজনের জীবন, নিজেদের সামান্য দাবি ও চাহিদা তারা জানিয়েছে উচ্চকণ্ঠে, না পেলে বাঁধিয়েছে পুরুষতন্ত্রের জন্যে অসুখকর কলহ; এ-ব্যাপারগুলোই নব্য আদমের জন্যে অপ্রীতিকর ও বিরক্তিকর, ক্ষুব্ধ আদম তাই গড়ে নিতে চেয়েছে মনমতো বাঁদী; বিনীত, সহনশীল, অনুগত, নিঃশব্দ নির্দেশ পালনে সদা তৎপর, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান বাঁদী। রূপে সে অতুল্যা, কিন্তু রূপগর্বশূন্য; সেবাই সে ক্লান্তিহীন, কিন্তু তার মন গুণগর্বহীন। স্বামীর সেবা ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে ওই দাসী সদা প্রস্তুত, স্বামীর সংসারের পারিপাট্য নিজের হাতে সম্পন্ন করে সে মহাসুখী হয়, অজস্র দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও সংসারের সকল কাজ নিজের হাতে করে সে নিজেকে প্রমাণ করে অতুল্যা সাধ্বী দাসীরূপে। স্বামীকে সে প্রভু জেনে সুখ ও গর্ব বোধ করে এবং নিজেকে তার চরণাশ্রিত দাসী ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারে না। সকলের সেবা নিজ হাতে করাই তার জীবন। স্বামীর সম্পদকালে সে চরণাশ্রিত দাসী, স্বামীর বিপদকালেও সেই দাসীই পরম সহায় হয়ে পাশে থাকতে পেরে ধন্য বোধ করে। দূর অতীতের বিবি রহিমার সকল বৈশিষ্ট্য নব্য আদম পেতে চায় তার বিবির মধ্যে। আদি রহিমার জন্যে লেখাপড়া জানাটা জরুরি ছিলো না; কিন্তু এই নব্য রহিমাদের স্বল্পলেখাপড়া জানা অতি জরুরি। নব্য রহিমাদের শুধু রূপসী হওয়াই যথেষ্ট নয়, রূপের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে শিক্ষা। কেননা এর সাহায্যে তাদের দীক্ষিত দাসীতে পরিণত করা সহজ। এই নব্য আদম উচ্চকুলের রূপসীকে বিবি হিশেবে গ্রহণ করে না এজন্যে যে, 'পাত্রী সুন্দরী হইলেও অশিক্ষিতা'।

আনোয়ারা উপন্যাসের নায়ক বি. এ পর্যন্ত পড়াশোনা করা তরুণ, প্রবল

ধর্মশাসিত। সে উচ্চকুলের নিরক্ষর রূপসীকে প্রত্যাখ্যান করে। সে এবং তার গোত্রের সকলে বিশ্বাস করে ওই 'অশিক্ষিতা' স্ত্রীরা জীবনকে গরলে ভরে দেয়। যেমন দিয়েছে তার বিমাতা, যে উচ্চকুলের নারী। অশিক্ষিতা রূপসী বিমাতা তার পিতার জীবনে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে; রূপসী বিমাতা মূক দাসী না হয়ে, হয়ে উঠেছে চালিকা সঙ্গিনী। সংসার চালনা করেছে নিজের ইচ্ছেমতো। জীবন কাটিয়েছে নিজের ইচ্ছেমতো। এ-ব্যাপারগুলো নব আদমের পছন্দ হয় নি। তার মনে হয় বিমাতা 'গৃহস্থালীর কর্ত্রী' হবার পর তাদের সংসারে অশান্তি আসে এ- কারণে যে, বিমাতা সকল কাজ নিজের হাতে সম্পন্ন করে না। স্বামীকেও নিজের হাতে সেবা করে না। নব্য আদমের চোখে ওই ব্যাপারগুলো এভাবে ধরা পড়ে :

> পিতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য ডাক পড়িলে কেবল চাকরানীরা তাহার সন্নিহিত হইত; বিমাতা কেবল সময় সময় অভাব-অভিযোগের কথা লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইতেন। তাহার গর্ভজাত কন্যাও নিজের সুখ-সুবিধা ছাড়া অন্য কোনদিকে নজর করিবার বড় অবসর পাইতেন না। মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার ও সুগন্ধি তৈলাদির জন্য তিনি পিতাকে অহরহ ত্যক্তবিরক্ত করিতেন। তাহার গতি-বিধিতে, তাহার প্রত্যেক কথায়, তাহার প্রতি নিঃশ্বাসে কেবল আভিজাত্যের অভিমানই প্রকাশ পাইত।... পিতা ১৪ দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করেন... এই সময় বিমাতা তাহার পরিচর্যা করেন নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহার পরিচর্যায় আন্তরিক অনুরাগ ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে পিতার যখন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল...বিমাতাও পতিশোকে শোকাকুলিতা হইলেন বটে, কিন্তু তদসঙ্গে লোহার সিন্দুকের চাবিটিও হস্তগত করিতে ভুলিলেন না। বিমাতার ব্যবহারে নূরুল এসলামের করুণ হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল।

'নূরুল এসলামের করুণ হৃদয়ে দারুণ আঘাত' লাগার কারণ তার নিরক্ষরা বিমাতা মর্ষকামিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নি। সে নিজের চাহিদা মেটাতে তৎপর, স্বামীশোকে পাথর হয়ে সবকিছু নূরুল এসলামের হাতে তুলে দিয়ে নিজে শুধু কষ্ট- শোকটুকু ভোগ করে নি, নিজের সম্বল রক্ষার ব্যাপারে সে সজ্ঞান ছিলো। এই সতর্কতা ও সচেতনতা পুরুষতন্ত্রের অপ্রিয়ভাজন করে তুলেছে ওই নারীকে। নব্য আদম আবার প্রবল ধার্মিক পুরুষ, বিবাহ তার কাছে এক ধরনের ধর্মাচরণ মাত্র। তার গভীর বিশ্বাস 'পারিবারিক ধর্মভাব ও প্রীতি পবিত্রতা অশিক্ষিত স্ত্রীলোক সংসর্গে পাইবার আশা, মরুভূমিতে নন্দনকাননের সুখসৌন্দর্য ভোগের আশার ন্যায় দুরাশামাত্র'। কেননা নিরক্ষর স্ত্রীরা তাদের আত্মপরায়ণতা ও আত্মসচেতনতা দিয়ে পুরুষকে স্বস্তিতে আধিপত্য চালাতে দেয় না। এ কারণে 'অশিক্ষিতা রমণীর প্রতি

তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল'। তাই, 'পিতা যে বংশে কাবিন নিয়া নগদ অজস্র অর্থাদি ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, মুরুব্বিহীন নূরুল এসলাম সেই উচ্চকুলোদ্ভূত সুরূপা পাত্রীকে বিবাহ করিতে অসঙ্কোচে অম্লান বদনে অস্বীকার করিলেন'। লেখক নূরুল এসলামের এই প্রত্যাখ্যানকে তার চরিত্রের অত্যন্ত সাহসিকতা ও অকুতোভয়তার নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। কেননা সে সহায়-সম্বলহীন এক যুবক হয়েও সমাজের প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নূরুল এসলাম প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে– তবে এই প্রত্যাখ্যান তার কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা তার অগ্রসর চেতনার পরিচয়বাহী নয়। এটি নব্য আদমের নব্য আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন অবস্থা মাত্র। নূরুল এসলাম বিশ্বাস করে, 'বিবাহ যাবজ্জীবনের সম্বন্ধ। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ অধিকাংশকাল এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে।' সে পূর্ব প্রজন্মের চেয়ে হিশেবী, সতর্ক। সে 'যাবজ্জীবনের সম্বন্ধ' গড়তে চায় অনুগতা বাঁদীর সঙ্গে; সে চায় বাধ্য, বশমানা নব্য বিবি রহিমাকে। তাই তার প্রতিজ্ঞা এমন : 'মনের মত শিক্ষিতা পাত্রী পাইলে বিবাহ করিবেন নচেৎ করিবেন না।'

এই প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে গরিবের মেয়ে উপন্যাসে নূর মোহাম্মদের জীবনে। সে বোধ করে তার জীবন বিষাক্ত হয়ে গেছে অশিক্ষিতা প্রথমা স্ত্রীর কারণে। কারণ সে কুলরূপগর্বে গর্বিতা; স্বামীর আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ কোনো কিছুতেই সে কর্ণপাত করে না। সে বশমানা নয়, গৃহস্থালীর সকল কাজ নিজের হাতে সম্পন্ন করতে অনীহ সে। সে নিজে বাঁদী হয়ে না উঠে সংসার চালাতে চায় গৃহপরিচারিকা ও ভৃত্যের দ্বারা। সে বিনীত নয়, বাধ্য নয়, প্রভুর নির্দেশ পালনে সদাতৎপর বাঁদী নয়। এসব কিছু তার স্বামী নব্য আদম নূর মোহাম্মদকে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করে তোলে। নূর মোহাম্মদ তাকে ধর্মীয় নানা উপদেশ দিতে যায়; কিন্তু তহুরা খাতুন তা না মেনে জীবন চালাতে থাকে নিজের মর্জিমতো। নূর মোহাম্মদ বোধ করে তহুরা নিরক্ষরা বলেই সে সদুপদেশের মহিমা বুঝতে ব্যর্থ এবং ওই সদুপদেশ পালনে অমনোযোগী। তাই তার চিত্র বিমুখ হয়ে ওঠে। ওই রূপসী নিরক্ষর স্ত্রী সম্পর্কে তার মনোভাব এমন:

> তহুরা খাতুন সুন্দরী ও বড়ঘরের মেয়ে বটে; কিন্তু একেবারে নিরক্ষরা ও আলস্যপরায়ণা, পরন্তু গৃহস্থালীর কার্যে অমনোযোগিনী, এমন কি বাঁদী দাসীগুলিকে ফয়ফরমাস করিয়া খাটাইয়া গৃহকার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান করিতেও সে জানিত না।... শিক্ষিত ও ভদ্রোচিতভাবে ছেলেমেয়েগুলিকে লালন পালন করিবার শক্তিও ইহার নাই।

'এজন্যে দারুণ ক্ষোভে' নূর মোহাম্মদের 'অন্তঃকরণ আলোড়িত' হয়; 'ঘরে দ্বারে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা, গৃহের আসবাবপত্রের বিশৃঙ্খলা, সর্বোপরি

ছেলেমেয়েগুলির নোংরা অবস্থা দেখিয়া নূর সাহেবের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়।' 'কিন্তু তহুরা খাতুন স্বামীর উপদেশ ধারণায় আনে না বা ধারণা করিতে সমর্থ হয় না।' ক্ষুব্ধ নূর মোহাম্মদের তাই দরকার হয়ে পড়ে 'সুশিক্ষিতা পাত্রী'র। সে প্রতিজ্ঞা করে:

> যেরূপে পারি লেখাপড়া জানা পাত্রী বিবাহ করিবই এবং তাহাকে আরও উচ্চশিক্ষায়, উচ্চসদগুণে ভূষিত করিয়া এই নিরক্ষরা বর্বর স্ত্রীর সামনে এমনভাবে উপস্থিত করিব যে, এ তাহার ব্যবহার ও কার্য দেখিয়া লজ্জায় ও অনুতাপে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরে। পরন্তু তাহার অসার কৌলান্যাভিমান চূর্ণ হইয়া যায়।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের কারণ হিশেবে নূর মোহাম্মদ প্রথমা স্ত্রীর অপরিচ্ছন্নতা, আলস্যের মতো মহাক্রটি নির্দেশ করলেও, এ সত্য স্পষ্ট যে ওই অবিনয়ী, গর্বিতার ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি বলেই ওই স্ত্রীর সঙ্গ তার জন্যে সুখকর হয়ে ওঠে নি। এই নারী বশীভূতা, আত্মোৎসর্গকারী বাঁদী নয়। সে স্বেচ্ছাচালিত, তাই অপ্রিয় ও অস্বস্তিকর। এ-কারণেই দরকার হয়ে পড়ে 'লেখাপড়া জানা পাত্রী'র, যে হাদিস-কালাম পাঠ করে জেনেছে পতি-মাহাত্ম্য, যাকে পছন্দমতো শিক্ষা দিয়ে নব্য আদম সহজেই পরিণত করতে পারবে অতি মনমতো বাধ্য বাঁদীতে এবং যার প্রভু হয়ে তার অহং থাকবে তুষ্ট ও তৃপ্ত। তহুরা খাতুনের জীবনে 'সতীন কাঁটা' এনে দিয়ে পুরুষতন্ত্র নব্য বাঙালি কন্যাদের বুঝিয়ে দিয়েছে পতি অনুগতা বাধ্য বাঁদী না হবার পরিণাম কী হতে পারে!

নব্য আদমের চোখে নারী : 'আত্মপ্রসাদ, আত্মসুখাকাঙ্ক্ষিনী, পরশ্রীকাতরা'

নব্য আদম নতুন কালের মানুষ, কিন্তু তার চেতনা আদিম অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার চিত্তলোক ভরে আছে ইসলামী পুরুষতন্ত্রের প্রবল আত্মম্ভরিতা ও নারীবিদ্বেষে। নিজেকে সে অবিসম্বাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে, কারণ সে পুরুষ। তার চোখে নারী ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট। আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে, মনোয়ারা, সালেহা-র লেখকেরা এ- অপবিশ্বাসটি বদ্ধমূল করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন যে, পুরুষ নারীর প্রভু এবং নারীর চেয়ে উৎকৃষ্ট। নিকৃষ্ট নারীর প্রতি তাঁদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রবল। যে কোনো ছুতোয় তাঁরা ওই ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন এবং নারী যে ঘৃণ্য তা প্রমাণের জন্যে থাকেন সদা প্রস্তুত। এ- লেখকেরা নারীকে দুটি গোত্রে ভাগ করেন এবং দু'রকমের নারীর প্রতি পোষণ করেন দুই বিপরীত আবেগ। এক গোত্রে আছে তাঁদের বাঞ্ছিতা আত্মবিলোপ দক্ষ দাসীরা, যাদের সংখ্যা গুটিকয়; লেখকেরা তাঁদের স্তুতি করেন। অন্য গোত্রে আছে সংসারের সকল সাধারণ নারী। ওই নারীর প্রতি তাঁরা পোষণ করেন বিরাগ ও বিদ্বেষ। বাঞ্ছিতা অনুগতা দাসী 'পতি সুখাকাঙ্ক্ষিনী', কিন্তু সাধারণ সকল নারী 'আত্মসুখাকাঙ্ক্ষিনী'। কাম্যা বাঁদী সকল সদগুণের আধার। সে 'ফাতেমা জোহরার ন্যায় ধৈর্য্যশীলা রূপবতী'; একই সঙ্গে 'ধর্মশীলা', 'বুদ্ধিমতী', 'মিতব্যায়শীলা'। আনোয়ারা-এর লেখক ওই মর্ষকামী বাঁদীর স্তবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। তিনি জানান, তাঁর উপন্যাসের নায়কের 'ফাতেমা জোহরার ন্যায় ধর্মশীলা, রূপবতী' 'জননী জীবিতকাল পর্যন্ত অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সর্বাগ্রে' স্বামী 'প্রাতঃকৃত্যের আয়োজন করিয়া দিতেন। পরে তিনি নিজে ওজু করিয়া ফজরের নামাজ পড়িতেন। স্বামীর স্নানাহারের পূর্বে দিন কাটিয়া গেলেও,... আহার করিতেন না।' কিন্তু সংসারের অন্য নারী এমন করে না। তারা ত্যাগ ও সংযমের সাধনা করে না। বরং স্বামীর কাছে দাবি করে বস্ত্র, অলঙ্কার ও সংসারের কর্তৃত্ব। নারীর এই স্পর্ধা নব্য আদমকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। ক্ষিপ্ত করে তোলে এই লেখকদেরও। তাঁরা এর প্রতিবিধানে তৎপর হন। এমন মন্দ নারীর

জীবন কেমন দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে তাঁরা তার বিবরণ রচনা করে চলেন। ওই মন্দ নারীর কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ওঠা স্বামীটির জন্যে তাঁরা শোকাতুর হয়ে ওঠেন।

নারী চির অবিশ্বাসিনী বলেই তাঁদের বিশ্বাস। নব্য আদম তার স্বপ্নের বাঁদীকেও বিশ্বাস করে না, তার প্রতিও রয়েছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তবে তা থাকে প্রচ্ছন্ন এবং ওই অবিশ্বাস কোনো না কোনো সময় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নব্য আদম নিজেকে গণ্য করে শক্তিমান, মহৎ, নিয়ন্ত্রক, সক্রিয়, হৃদয়বান, বিবেকবান, বুদ্ধিমান, সজ্জন বলে। এ-উপন্যাসগুলোতে লেখকদের যে নারী ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তা এমন : নারী পাপিষ্ঠা, দজ্জাল. অসতী, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রষ্টা, লোভী, হিংসুটে, কুমন্ত্রণাদাত্রী, স্বার্থপর, নির্বোধ, ইতর, দাম্ভিক, মিথ্যুক, দয়ামমতাশূন্য, এবং বিবেকহীন। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে কোনো কুকর্ম নারী অবলীলায় করতে পারে। পুরুষের সকল সর্বনাশের মূলে নারী। নারী রূপবতী; কিন্তু এই রূপ দিয়েই সে পুরুষের সর্বনাশ ঘটায়। শয়তান যেমন গণ্য হয় আদমের মহাশক্ররূপে, এ-গ্রন্থগুলোতে পুরুষতন্ত্রের অতিঅনুগত প্রতিনিধিরা তেমনি সকল সাধারণ নারীকে প্রতিপন্ন করেছেন পুরুষের মহাশক্ররূপে। তাঁরা দেখান নিষ্পাপ পুরুষকে কীভাবে এবং কতোটা পাপী করে তোলে নারী শয়তান। পুরুষ উদারহৃদয়, সরলচিত্ত, আত্মপরভেদশূন্য, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, নিষ্কলুকষ, ক্ষমাশীল, দয়ালু। পুরুষের পদস্খলনের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী নারী। নারীর ফুসলানির কারণেই পুরুষ নষ্ট অমানুষ হয়ে ওঠে। পুরুষের স্বভাবে কোনো ইতরতা নেই, নারী প্ররোচনাই পুরুষকে ইতর করে তোলে।

এ- লেখকেরা নারীর রূপযৌবনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে গণ্য করেন। তাঁদের পুণ্যবতী সতী বাঁদীর শরীর থেকে যেমন উপচে পড়ে রূপযৌবন; তেমনি মুখরা, খল নায়িকার শরীরেও আছে ঢলঢলে যৌবন। নারী পুরুষের কামসামগ্রী, এ-কথা তাঁরা নিজেরা যেমন ভোলেন না, তেমনি পাঠককেও ভুলতে দেন না। সবক'টি উপন্যাসেই লেখকেরা জানান, ওই কামসামগ্রীর দেহে রূপযৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মগজে বুদ্ধিও আছে। তবে তাঁরা নারীর মহিমা বৃদ্ধির জন্যে এ-তথ্য দেন না, এ তথ্যটি জ্ঞাপন করেন নারীকে মহিমাশূন্য করে তোলার জন্যে। তাঁরা বিশ্বাস করেন এবং দেখান যে, নারীর রূপযৌবন ও বুদ্ধি পুরুষকে পাপের পথে টেনে নেবার অমোঘ চুম্বক ছাড়া আর কিছু নয়। নারী তার রূপযৌবন ব্যবহার করে পুরুষকে অন্ধ, পথভ্রষ্ট করে তোলার জন্যে; আর তার বুদ্ধি দিয়ে সে পুরুষকে নষ্ট হবার নানা কৌশল বাতলে দেয়। এই ডাইনীর ছলাকলার জন্যেই ঘরে ঘরে 'হিংসানল চির প্রজ্বলিত।' মনোয়ারা-র লেখকের কাছে নারী হিংসা ও স্বার্থপরতার মানবীরূপ। তিনি নারীর জন্যে তৈরি করেন অজস্র বিশেষণ; যাতে মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর নারীবিদ্বেষের ভয়াবহতা। তিনি নারীকে অভিহিত করেন 'কুটিল

স্বার্থপর'; 'আত্মপ্রসাদ আত্মসুখাকাঙ্ক্ষিনী ও পরশ্রীকাতরা'; 'কূটবুদ্ধি নারী' প্রভৃতি অভিধায়। তাঁর বিশ্বাস নারী 'স্ব স্ব কুঅভিসন্ধি সাধনে' সদা তৎপর। নারীকে সম্বোধন করে এই লেখক বলেন :

> হায় কূটবুদ্ধি নারী জাতি! লীলাময় জগতে তোমাদেরও এক অসীম লীলা! তোমরা এতই স্বার্থপর যে, অন্যের সুখ দেখিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পার না। ওহো! তোমরা যদি কুটিল স্বার্থপর না হইতে তবে না জাতি এই নশ্বর জগতে কতই সুখশান্তি বিরাজ করিত!

নারী সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত :

> সহৃদয় পাঠকগণ! বোধহয় আপনারা অবগত আছেন যে, আত্মপ্রসাদ, আত্মসুখাকাঙ্ক্ষিনী ও পরশ্রীকাতরা রমণীগণ তাহাদের স্ব স্ব কুঅভিসন্ধি সাধনে কখনো বিরত হয় না।

এর পর ওই লেখকের কাজ হয় 'কুঅভিসন্ধি' পরায়ণা নারীর নানা কীর্তির বিবরণ তুলে ধরা। এ-উপন্যাসের নায়ক সামসুল আলম। পিতৃমাতৃহীন নিঃসম্বল সামসুল আলম মামাদের সংসারে আশ্রয় নেয়। মামারা তাকে সাদরে আশ্রয় দেয়; কিন্তু মামীরা তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এই আশ্রিত বালক কালে নিজের সন্তানদের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে উঠবে ভেবে তারা ক্ষেপে যায় এবং অনাথ বালকটিকে তাড়াবার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। মামারা স্ত্রীদের মতো স্বার্থবুদ্ধি তাড়িত অমানুষ নয়, তারা দয়ালু। তারা অনাথের প্রতি দায়িত্ব পালন করে যেতে চায় চিরকাল, কিন্তু স্ত্রীদের ফুসলানি ও কুমন্ত্রণা ওই সৎকর্মে তাদের অটল থাকতে দেয় না। লেখক বলেন :

> বর্ষার বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিতে পারে ? সে আপনা আপনি বাঁধ অতিক্রম করিয়া সমস্ত পৃথিবী একাকার করিয়া ফেলে। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। বালকের মামীগণের কুঅভিসন্ধি কার্যে পরিণত হইল। তাহারা কৃতসঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত না হইয়া ক্রমে নানা ছলেবলে স্ব স্ব স্বামীর প্রাণ কাড়িয়া লইল এবং স্ব স্ব স্বামীর হৃদয় পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীবৎ অহর্নিশ কানের কাছে রাখিয়া পড়াইতে পড়াইতে তাহাদের মতের পৃষ্ঠপোষক করিয়া ফেলিল।

এভাবে তারা 'নানাবিধ বাক্য দ্বারা কলের প্রেসে যেমন কাগজ চাপ দিয়া ধরিয়া তদুপরি ছাপার অক্ষর প্রতিফলিত করে, তদ্রূপ স্ব স্ব স্বামীর হৃদয়ের সাধুইচ্ছা ও উদার প্রবৃত্তির উপর একখানা স্বার্থমিশ্রিত সন্দেহের ছবি আঁকিয়া' দিতে সমর্থ হলো। নারীকে এখানে দেখানো হয়েছে কালিমালিপ্ত করে, মহাপাপীরূপে: আর পুরুষকে করে তোলা হয়েছে নিষ্পাপ। এই লেখক ও অন্যরা দেখান কুমন্ত্র দেয়ার

ব্যাপারে ইবলিশের চেয়েও বেশি তৎপর ও দক্ষ নারী, সে সফলও হয় সবচেয়ে বেশি। আদি হাওয়ার মতোই নারী এখানে নিষ্পাপ আদমকে পাপের পথে যাবার জন্যে ফুসলানি দেয়, আর আদি আদমের মতো পুরুষ এখানেও দ্বিধা-কুণ্ঠা-জড়তা নিয়ে নারীর ফাঁদে পড়ে। তবে পুরুষের মহত্ত্ব প্রকট করে তোলার কাজে লেখক নিরলস। তিনি দেখান নারীর ফুসলানিতে পুরুষ বিভ্রান্ত হতে পারে; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই পুরুষ নারীর মতো বিবেকহীন, চক্ষুলজ্জাহীন ও অমানুষ হতে পারে না। নিতান্ত অনিচ্ছায় পুরুষ কুচক্রী নারীর ষড়যন্ত্রের সহযোগী হয়, কিন্তু তাদের মানবিকতা ও চক্ষুলজ্জা থাকে চির অক্ষুণ্ন। তাই ষড়যন্ত্রকালেও স্বামীরা স্ত্রীদের হুঁশিয়ার করে দেয় এভাবে ঃ 'সাবধান আমাদের সম্মুখে যেন কোন কথা বলা না হয়, তাহা হইলে বড়ই লজ্জিত হইব'। আর স্বার্থান্ধ নারী সব অবস্থাতেই নির্লজ্জ। হিংস্রতা ও পাশবিকথা তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। নিজের 'কুঅভিসন্ধি' চরিতার্থ করার জন্যে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। তাই হিংস্র পাশবিক আচরণ সে নির্দ্বিধায় করে।

নব্য আদম বিশ্বাস করে নারীর হৃদয় হিংসায় পরিপূর্ণ, আর তার মুখে বিষ ছাড়া কিছু নেই। নারীকে 'ক্রূর', 'কটুভাষিণী', 'ক্রোধপরায়ণ', 'পীড়নকারী' ও 'হিংসুটে' বলে প্রতিপন্ন করেন সালেহার লেখক। সহনশীলা, অনুগতা, বাঞ্ছিতা সালেহার পাশে তিনি তুলে ধরেন হিংস্র পীড়নকারী এক নারীর ছবি। এ-নারীকে তিনি তুলে ধরেন নির্বিশেষে সকল সাধারণ নারীর প্রতিনিধি হিশেবে। এ-লেখক এবং অন্যরা নারীকে হিংস্র পীড়নকারীরূপে দেখিয়েছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যেই তাঁরা নারীর স্বভাবে এমন অস্বাভাবিক হিংস্রতা আরোপ করেছেন। এভাবে নারীকে আরো ঘৃণ্য করে তুলে তাঁরা উল্লাস বোধ করেছেন। এতে পুরুষতন্ত্রের এই প্রতিভাশূন্য অন্ধ স্তাবকদের হীনতাই প্রকট হয়ে ওঠে। সালেহার চাচী ঘোর স্বার্থান্ধ এবং হিংস্র। তবে সে স্বামীর ওপর পীড়ন চালায় না, স্বামীর সংসারের সাশ্রয়ের জন্যে আশ্রিতদের ওপর পীড়ন চালায়। নির্যাতন করে সে তৃপ্তি পায় এবং কারণে-অকারণে সে কটুবাক্য দিয়ে অসহায়দের নির্যাতন করে। কটুকথা দিয়ে যন্ত্রণা দিতে তার তুলনা নেই এবং সেও চক্ষুলজ্জাহীনা নারী। বালিকা সালেহাকে সে দাসীর মতো খাটায় এবং ওই বালিকার সামান্য ত্রুটিতেই তাকে নানাভাবে প্রহার করে। প্রায়শই 'সালেহার কোমল গণ্ডে বা পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাতের ফলস্বরূপ নিষ্ঠুর চাচীর অঙ্গুলি চিহ্ন ফুটিয়া উঠে'। সে নিজের পুত্রকন্যাদের প্রতি স্নেহশীল; কিন্তু অনাথ দেবর পুত্রকন্যার প্রতি নির্দয়। তাদের অনাহারে রেখে নিজের পুত্রকন্যাকে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাওয়ায়। সেই এতোই ইতর যে এতেও সে সন্তুষ্ট থাকে না। খাবার সময় আশ্রিতদের সর্বদা এই বলে পীড়ন করে যে, 'তোমরাই যদি সব খাবে তো আমার ছেলেরা কি খাবে ?...এত

দিলেও নাম নাই'। লেখক দেখান ওই পীড়নকারী নারীর স্বামী হুদা সাহেব এমন পীড়নকারী নয়। বরং সে বিবেচক, উদারহৃদয় পুরুষ। কিন্তু শুধুমাত্র স্ত্রীর হীন প্ররোচনায় সে পরিণত হয় বিবেকহীন, স্বার্থান্ধ, নিষ্ঠুর মানুষে। সালেহার লেখক ও অন্যদের মতোই জানান যে, পুরুষ বিবেকহীন অন্ধে পরিণত হয় নারীর ফুসলানির কারণে। এ-লেখকও জোরেসোরে জানিয়েছেন যে স্বামী অমানুষ হতে বাধ্য হয় অমানুষ পত্নীর কারণে। তিনি বলেন :

> পাঠক এই স্থানে হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন, তবে কি হুদা সাহেব অজ্ঞান ছিলেন, না তিনি এসব দেখিয়াও দেখিতেন না ? তিনি অজ্ঞান ছিলেন না। আর তিনি যে কিছু দেখিতেন না শুনিতেন না এমন নহে। সব দেখিতেন সব শুনিতেন; কিন্তু দেখিলে শুনিলেই বা কি হয় ? স্ত্রী ক্রুরমনা ও চতুরা হইলে স্বামী কতক্ষণ ন্যায়পথে থাকিতে পারেন ? প্রথম প্রথম তিনি সালেহা ও তাহেরের যত্ন লইতেন, বৃদ্ধা জননীর প্রতিও তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব ছিলো না। কিন্তু দিন দিন প্ররোচনায় তিনি এখন তাহার প্রতি বিমুখ। সালেহা ও তাহের যে তাহার পুত্রকন্যার প্রতিদ্বন্দ্বী, এ জ্ঞান তাহার অন্তর মধ্যে দৃঢ়ভাবেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ জননীর প্রতিও তাহার এখন ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই।

সৎ ও কোমল হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের সদগুণ নষ্ট করে দেয় পাপিষ্ঠা নারী। এই পাপিষ্ঠার চিত্তে 'হিংসানল' সর্বক্ষণ 'দাউদাউ' করে জ্বলে, সে কিছুতেই অন্যের ভালো সহ্য করতে পারে না। সালেহার রূপ গুণ তার চাচীকে সুখী করে না, বরং হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সালেহা তার নিজের মেয়ের চেয়ে রূপসী বলে সে তাকে সহ্য করতে পা রে না, সালেহার ওপর তার পীড়নের মাত্রা বেড়ে যায়। গালিগালাজের সঙ্গে যোগ হয় প্রহার। তাই 'উঠিতে বসিতে নুটি খুঁটি ধরিয়া সালেহাকে প্রহার করিয়া তিনি নিজের হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ' করেন। তাতেও তার মন শান্ত হয় না। কেবলই তার মনে হয় :

> সালেহার এত রূপ গুণ না থাকিলে আমার মেয়ে আজ অবিকি থাকে ? সালেহা যাহাতে দুনিয়ায় না থাকে তাহার উপায় করিতে হবে। নিতান্ত পক্ষে সে যাহাতে বিকলাঙ্গী হয় বা কুৎসিত দেখায় সে চেষ্টা করিতে হইবে।

ঈর্ষা তাকে অসীম হিংস্র করে তোলে। সে গরম ফেন ছুড়ে সালেহার রূপ নষ্ট করে দেবার চক্রান্ত করে, সালেহার খাবারে বিষ মিশিয়ে রাখে, সালেহাকে বিকলাঙ্গ করার জন্যে লোকও নিয়োগ করে সে। আশ্রিত তাহেরের প্রতিও এমন নির্মম আচরণ করে সে। তাহের তার পুত্রের চেয়ে সুশীল ও মেধাবী হওয়ার তাহের তার

মহাশত্রু হয়ে ওঠে এবং তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে সে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। নিজে নানাভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, তখন সে বশমানা স্বামীটিকে ব্যবহার করে কার্যসিদ্ধির জন্যে। লেখক বলেন, 'স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, বধূ স্বামীর দ্বারা তাহার প্রতি এরূপ কঠোরতর ব্যবস্থা করাইলেন- যাহাতে সে শীঘ্র ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়'। লেখক প্রতিপন্ন করেন কুটিলতা ও হিংস্রতা নারী স্বভাবের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। পুরুষ কুটিলতামুক্ত, দয়াবান ও অহিংস্র। এই রচনাগুলোতে দেখা যায় হিংস্রতা নারীরই একচেটিয়া, পুরুষ কখনোই হিংস্র কোনো কাজ করে না। হিংস্র কোনো কাজ করার কথা পুরুষ ধারণা করতেও পারে না; এমনই নিষ্পাপ সে। সে থাকে বড়জোর নির্দেশ পালনকারীর ভূমিকায়। 'নিরুপায়' পুরুষ নিষ্ঠুর হয় স্ত্রীর প্ররোচনায়, শুধু 'স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্যে'।

রূপযৌবন, ছলাকলা ও দুষ্টবুদ্ধি দিয়ে পুরুষের সর্বনাশ করে গোলাপজান আনোয়ারা উপন্যাসে। গোলাপজান অতি রূপযৌবনসম্পন্ন; কিন্তু মুখরা, দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন, রূঢ়ভাষিণী ও লোভী। লেখক তার প্রতি পোষণ করেন প্রবল ঘৃণা এবং ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে গোলাপজানের ভয়াবহ পরিণামের গল্প বলে এমন পাপিষ্ঠাদের বিষয়ে পুরুষকে সতর্ক হতে বলেন। গোলাপজান 'ভুবনমোহিনী সুন্দরী', পুরুষ তার রূপের মোহে 'হিতাহিত জ্ঞানশূন্য' হয়ে ওঠে। রূপের কারণে তার একাধিক বিয়ে হয় এবং স্ত্রী বিয়োগের পর আনোয়ারার পিতা ভূঞা সাহেব তাকে বিয়ে করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। গোলাপজান হীনবংশজাত বলে ভূঞা সাহেবের মা আপত্তি করলেও প্রৌঢ়পুত্র 'গোলাপজানের রূপের মোহে মাতার কথায় কর্ণপাত' না করে বিয়ে সম্পন্ন করে এবং স্ত্রীর বশমানা 'হুকুমবরদার' হয়ে পড়ে। লেখক ওই অবস্থার এমন বর্ণনা দেন : 'গোলাপজানের রূপে কি যেন এক মাদকাসক্তি ছিল। ভূঞা সাহেব কিছুদিনের মধ্যে সেই রূপে কায়মনপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন'। অন্যদের মতো এ-লেখকও মনে করেন নারীই ছলাকলা দিয়ে পুরুষকে এমন বিভ্রান্ত করে তোলে। তাই এটি নারীরই অপরাধ।

গোলাপজানের চিত্ত হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ। সে শাশুড়ি ও সৎকন্যাকে পীড়ন করে; সংসারের দাসী না হয়ে সংসারের কর্ত্রী হয়ে ওঠে এবং নিজের ইচ্ছেমতো সংসার চালনা করতে থাকে।

নারীর সংসার 'সর্বময় কর্ত্রী' হয়ে ওঠার ব্যাপারটি এই লেখকেরা পছন্দ করেন নি। তাঁরা পছন্দ করেন নারীর অনুগত পরিচারিকার ভূমিকা। তাঁরা চান নারী সকলের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করবে, আর নিজে থাকবে চির আজ্ঞাবহ ও নিঃশব্দ। যে নারী তা না থেকে সংসারের কর্ত্রী হতে চায় তাঁরা তার কঠোর নিন্দা করেন এবং নারীর কর্তৃত্বের কারণে সংসারে কেমন বিপর্যয় দেখা দিতে পারে তার বিশদ বিবরণ দেন। তাঁরা প্রচার করেন যে, নারীকে কখনোই 'আদর দিয়া' 'মাথায়'

তুলতে নেই। কারণ 'এর শেষ ফল বড়ই ভয়ানক, তখন চৈতন্য হইলেও নিস্তার নাই'। গোলাপজানকে লেখক এর উদাহরণ হিশেবে দাঁড় করিয়েছেন। 'স্বামী সোহাগ' পেয়ে 'গর্বিনী' গোলাপজান 'সংসারের সর্বময় কর্ত্রী' হয়ে ওঠে। তবে সে 'নিজ হস্তে সংসারের ভার' নেয় সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে নয়, বরং দুটি অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। তার প্রথম উদ্দেশ্য ছিলো 'সংসারের ভার নিজ হাতে থাকিলে ইচ্ছামতো জিনিসপত্র মা-ভাইয়ের বাড়ী পাঠান যাইবে।' 'দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আরো মারাত্মক'। সে চায় সতীন কন্যা ও বৃদ্ধ শাশুড়িকে প্রাণভরে পীড়ন করতে। নিজ হাতে সংসার চালনার ফলে ওই পীড়ন কার্যটি সে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারে। লেখক বলেন, 'স্বামীর সোহাগে সে এক্ষণে গৃহের কর্ত্রী, সুতরাং সে নানা প্রকারে তাহার এই বিদ্বেষ বিষে আনোয়ারাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ' করে। স্বামীর ওপর সে এতোটাই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে যে পুরুষটি হয়ে ওঠে বিবেকবর্জিত, অন্ধ, উদাসীন। স্ত্রীর রূঢ়তা তাই তখন তার কাছে রূঢ়তা বলে মনে হয় না। ওই সম্পর্কে কেউ 'দু কথা বুঝাইলে বলিলেও' স্বামীটি 'তাহা শুনিয়াও শুনে না। বৌ যাহা বলে অপরাধী লোকের ন্যায় সে তাহাই করে।'

পুরুষের এমন সর্বনাশের মূলে নারী, তার ফুসলানির ফলেই 'সোনার চাঁদ ছেলের' এমন মতিভ্রম ঘটে। গোলাপজান নিজের লোভের আঁচে স্বামীকে তাতিয়ে তোলে। পুরুষটি লোভ জয় করতে চায়; কিন্তু নারী পুরুষটির নিভন্ত প্রবৃত্তিকে লেলিহান করে দেয়। জামাতার অর্থকড়ি আত্মসাৎ করে ধনী হয়ে ওঠার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে গোলাপজান। তাই সে জামাতাকে হত্যা করার সঙ্কল্প নেয়। স্বামী ভয় পেয়ে আপত্তি জানালে তাকে ধিক্কার ও ফুসলানি দিয়ে চাঙা করে পাপের পথে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তার। জামাতাভ্রমে পুত্র বাদশাকে খুন করার কারণে দুজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড ভোগ করতে হয়। আর সতী, সাধ্বী, অনুগতা, পতিব্রতা আনোয়ারার জীবন দিনে দিনে আরো শ্রীমণ্ডিত ও সুখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এভাবে এ-রচনাগুলোতে নব্য আদম সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দীক্ষা প্রচারের দায়িত্ব। বিনীত পদসেবিকা হবার ফজিলত বর্ণনার পাশাপাশি দুর্বিনীতা নারীর ভয়াবহ পরিণাম ছড়া রঙে তুলে ধরেন লেখকেরা এবং স্পষ্ট করে তোলেন তাঁদের চেতনাজগত আচ্ছন্ন হয়ে আছে কতোটা অন্ধকার, দুরভিসন্ধি ও বিদ্বেষে।

নব্য বিবি : 'পরীর রানী বেহেশতের অপূর্ব্ব হুরী প্রতিমা'

যে বেহেশতী হুরের রূপযৌবন বর্ণনায় ধর্মগ্রন্থ ও মহাপুরুষগণ উচ্ছ্বসিত; নব্য আদম কামনা করেছে বেহেশতী ওই হুরকে। সে পেতে চেয়েছে হুরতুল্য মানবী। ওই লেখকদের নব্য বিবিরা রূপযৌবনে বেহেশতী হুর; তাঁদের রচনা পড়ে বোঝা যায় তাঁদের চেতনা আচ্ছন্ন হয়েছিলো বেহেশতী হুরের রূপযৌবনের কিংবদন্তি দ্বারা। তাই নব্য বিবি প্রসঙ্গে তাঁরা বারবার টেনে এনেছেন হুরীর উপমা। নব্য বিবি অতি রূপ ও যৌবনবতী, তীব্র কামোদ্দীপক ও অসূর্যম্পশ্যা। বেহেশতী হুর শুধুমাত্র পরকালে বেহেশতে পুণ্যবান পুরুষকে সেবা দেবে; সে চিরনিঃশব্দ সেবিকা, কামসহচরী। নব্য আদম এতোই যোগ্য ও শক্তিমান যে সে জীবদ্দশাতেই লাভ করে মানবীরূপী হুর, একইসঙ্গে যে নারী যৌনাবেদনময়ী ও পুণ্যবতী। আনোয়ারা, মনোয়ারা, সালেহা, নূরী-এরা সকলেই মধুর ভাষিণী; এদের হৃদয় ধারণ করে একনিষ্ঠ প্রণয়ের মধু আর শরীর ধারণ করে রূপের মধু- যা দিয়ে এরা পুরুষপ্রভুর জীবনকে মধুময় করে তুলে জীবন সার্থক করে। লেখকেরা সকলেই ওই 'হুরী প্রতিমা'র রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছেন। ব্যবহার করেছেন বহু বিশেষণ, বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছেন নানা বিপরীত বিশেষণ, তারপরেও অতৃপ্ত চিত্তে স্বপ্নের রানীর রূপযৌবন পাঠকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলার জন্যে উপমা উদাহরণ অন্বেষণ করেছেন। ওই নারীদের তুলনা করা হয়েছে নানা কিছুর সঙ্গে এবং তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লেখকদের সৌন্দর্যবোধের স্থূলতা। তাঁদের কাছে নারীসৌন্দর্য হচ্ছে শুধু পুরুষের সম্ভোগের বিষয়। ওই সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ বন্দনা করার ধারণা তাঁদের মধ্যে কখনো জাগে না। আরব্যরজনী কিংবা বাঙলা ভাষায় রচিত মধ্যযুগীয় রোমান্সগুলিতে নারীদেহের সৌন্দর্যের বিশদ বিবরণ যেমন দেয়া হয়েছে লোলুপ পুরুষকে উদ্দীপ্ত ও তৃপ্ত করার ইন্ধন হিশেবে; তেমনি এখানেও লেখকেরা তাই করেছেন।

নব্য আদমের কাছে নারী ক্ষুধা নিবৃত্তির সামগ্রী ও মূল্যবান জীবন্ত সম্পত্তি

বিশেষ। তাই রূপযৌবনসম্পন্ন নারীটিকে অধিগত করে সে উল্লাস ও গর্বে ফেটে পড়ে। তবে এ- উল্লাস ও গর্ব পুরুষপ্রভুর একচেটিয়া বিষয়। নারী এমন উল্লাসে চরাচর ভরিয়ে তোলে না; কেননা পুরুষতন্ত্র নারীর এমন উচ্চকণ্ঠ ও মুক্তকণ্ঠ হবার সকল দরোজা রুদ্ধ করে দিয়েছে অজস্র বিধিনিষেধ দ্বারা। সে অনুগৃহীত হয়েই কৃতার্থ হয়ে যায়। লুটিয়ে পড়ে প্রভুর পদচুম্বন করে নিজের নারীজন্ম ধন্য করে। নব্য বিবি রূপসী, তবু নিজের সম্পর্কে তার কুণ্ঠা লজ্জার শেষ নেই। পুরুষপ্রভুর চরণে ঠাঁই পাবার জন্যে সে কাতর ভিক্ষুকের মতো দয়া ভিক্ষা করতে থাকে। এরা ধনীকন্যা হলেও নিজের রূপযৌবন ও যোগ্যতা সম্পর্কে থাকে সন্দিহান ও কুণ্ঠিত। তারা এমনটি করে কারণ পুরুষতন্ত্র নারীর এমন ভূমিকাকেই নারীত্ব বলে প্রশংসা করে থাকে। এই নব্য বিবিরা সকলেই 'বিকাশোন্মুখ' কলি; নিষ্পাপ ও অনাঘ্রাত; কেউই প্রস্ফুটিত ফুল নয়। লেখকেরা সকলেই তাঁদের নায়িকাকে 'অস্ফুট কলিকা' বা 'বিকাশোন্মুখ' পুষ্পরূপে দেখতে পছন্দ করেছেন। ওই কলি ফোটে পতিপুরুষের স্পর্শে, পতিপুরুষের জন্যে। চিরঅসূর্যম্পশ্যা থাকে সে প্রভুদেবতার জন্যে। লজ্জা শুধু তার ভূষণ নয়, তার মহা ঐশ্বর্য। নব্য বিবির সকলেহ গভীর প্রণয়কাতর; কিন্তু গভীর লজ্জাশীলা। কোনো অবস্থাতেই বিবাহপূর্বকালে 'বুক ফেটে' গেলেও মুখ ফোটে না তাদের। তারা যাকে ভালোবাসে তার জন্যে জীবন উৎসর্গ করে দেয় নীরবে। এভাবেই তাদের বিবাহপূর্বকালে গভীর সতী হিশেবে দেখিয়ে লেখকেরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। ওই 'অস্ফুট কলিকা' বিয়ের পরে হয়ে ওঠে মুখরা; প্রণয় জ্ঞাপনে ও নিজেকে নিবেদনে থাকে লজ্জাশূন্য। লেখকেরা দেখান পুরুষপ্রভুকে পেয়ে নারীজন্ম সার্থক করতে পারে, অন্য কোনোভাবে নয়।

নব্য বিবি আনোয়ার জীবনও সার্থক হয় পতিপ্রভুর চরণে ঠাঁই পাওয়ার মধ্য দিয়ে। আনোয়ারা 'পুষ্পকলিকার' মতো 'অস্ফুট' ছিলো বিবাহপূর্বকালে। লেখক তাকে তুলনা করেছেন নানা পুষ্পকলিকার সঙ্গে কিন্তু কিছুতেই তিনি তৃপ্তিবোধ করেন নি। কখনো আনোয়ারাকে তাঁর মনে হয়েছে 'বিকাশোন্মুখ গোলাপ' কখনো মনে হয়েছে 'বালারুণ রাগরঞ্জিত বিকাশোন্মুখ পদ্মিনী'। তার সৌন্দর্য এতোই অসামান্য যে, তাকে দেখে 'সাধারণ মানবকন্যা বলিয়া বোধ হয়' না। মনে হয় 'কোন সুরবালা ভ্রমক্রমে মর্ত্যে' নেমে এসেছে। ওই 'সুরাবালার' চোখ সুন্দর, 'শতদল নিন্দিত'। সে 'সুচিক্কন কেশযুক্তা'। তার দীঘল কেশ সকলের ঈর্ষণীয়। তার কেশের সৌন্দর্য নূরুল এসলামকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার পেছনে বড়ো ভূমিকা পালন করে। নূরুল এসলাম এমন সঙ্কল্প করে যে, 'স্থানান্তরে বিবাহের প্রস্তাব চলিলে আমি ঘটককে এই চুল দেখাইয়া বলিয়া দিতাম, এইরূপ সুচিক্কন কেশযুক্তা পাত্রী না পাইলে বিবাহ করিব না।' আর আনোয়ারা পূজা করতে থাকে নূরুল এসলামের পরিত্যক্ত চটি জুতোজোড়ার– যা নূরুল এসলাম ভুলবশত

আনোয়ারাদের বৈঠকখানায় ফেলে এসেছিলো। পদসেবিকার তপস্যার সঠিক উপাদান যথাযথভাবে নির্দেশ করতে কোনো ভুল হয় নি পুরুষতন্ত্রের প্রতিনির্ধিটির। আনোয়ারা যখন বিয়ের কনের সাজে সজ্জিত হয়, তখন তার সৌন্দর্যের দীপ্তির কাছে নিষ্প্রভ মনে হয় স্বর্ণালঙ্কার ও রেশমবস্ত্রের দীপ্তি। তার 'দেহলাবণ্যপ্রভা' 'স্বর্ণাভ অঙ্গের জ্যোতি' 'রেশমী বস্ত্রের দীপ্তি আরো উজ্জ্বল' করে তোলে। 'অকস্মাৎ বিজলীর আলোকে যেমন চক্ষু ঝলসিয়া যায়'; আনোয়ারার রূপ ও সজ্জাও তেমনি সকলের চক্ষু ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু সে রূপগর্বশূন্য এবং গভীর লজ্জাশীলা। লজ্জা তার সৌন্দর্য ও স্বভাবের বড়ো ঐশ্বর্য বলে লেখক প্রতিপন্ন করেন। লজ্জায় যখন আনোয়ারার 'গোলাপগণ্ড রক্তিমাভ' হইয়া ওঠে এবং 'স্বেদবারিবিন্দু মুখমণ্ডলে ফুটিয়ে বাহির হইতে' থাকে, লেখক তখনকার ওই সৌন্দর্য কল্পনা করে আত্মহারা হয়ে ওঠেন এবং এমন বর্ণনা দেন :

'পাঠক, সোনার গাছে মুক্তাফল বুঝি এইরূপেই ফলে'। তাকে দেখে সকলেই অভিভূত হয়ে যায়। সকলেই বিশ্বাস করে 'এ মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ পরী।...এ মেয়ে পরীও নয়, পরীদিগের মাথার মণি।' নূরুল এসলাম ওই 'কনক প্রতিমার চম্পকবিনিন্দিত কোমল করাঙ্গুলি' 'করে ধারণ' করে এবং 'প্রাণ প্রতিমার এই অপার্থিব মাধুরী' দেখে 'আত্মহারাবৎ' হয়ে ওঠে এবং বোধ করে 'আজি আমিও কোহিনূর লাভ করিয়া ধন্য হইলাম'।

মনোয়ারাও মর্ত্যে জন্ম নেয়া বেহেশতী হুর। তার রূপ বর্ণনায় লেখক অতি উচ্ছ্বসিত। লেখকের বর্ণনা সুদূর সৌন্দর্যের জন্যে ব্যাকুল করে না তুললেও সম্ভোগের বাসনাকে বেশ উদ্দীপ্ত করে তোলে। মনোয়ারা রূপে 'অতুলনীয়া'। লেখক ওই রূপের ছটায় নিজেই এমন মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন :

> তাহার হৃষ্টপুষ্ট সুগোল সুঠাম শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। দূর হইতে তাহাকে দেখিলে একটি সুবর্ণ প্রতিমূর্তি বলিয়া লোকের ভ্রম জন্মে। মুখকান্তি অতীব সুন্দর-সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনোলোভা। বোধহয় বিধাতা বিরলে বসিয়া এই অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নিগ্ধ জ্যোতিপূর্ণ আয়ত নয়ন, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা, মুক্তাপাতির ন্যায় দর্শনাবলী। ললাট ক্ষুদ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় সুষমা দীপ্ত। কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশরাশি অতি আনন্দদায়ক। তাহার সর্বাঙ্গেই যেন লাবণ্য লহরী ক্রীড়া করিয়া ফিরিতেছে।

তাকে দেখামাত্রই পাবার ক্ষুধায় শরীর মন জরজর হয়ে ওঠে। তাকে প্রথম দেখে প্রেমিক শামসুল আলম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়, 'বুঝিবা কোন স্বর্গীয় হুর মানবী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া...এই ছাদের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নচেৎ এমন

দেবদুর্লভ সর্বশ্রেষ্ঠ রূপমাধুরী মানবগৃহে জন্মানো অসম্ভব।' আবিষ্ট যুবকের বিভ্রম কিছুতেই ঘোচে না। 'আমি কি বৈচিত্র্য দেখিয়াছি, সত্যই কি সে হুর। না- না, আমি ভ্রম দেখিয়াছি... হুর নহে মানবী, কিন্তু মানবী হইলেও সামান্য মানবী নহে'। ওই 'মনোমোহিনী বালিকার ভুবন ভুলান রূপের ছবি' চিত্তে নিয়ে সে তাকে পাবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। নামাজের মোনাজাতে তার একমাত্র প্রার্থনা, 'হে করুণাধার... যেন এহেন হুরী রূপীর প্রণয়লাভে সংসারী হইতে পারি'। মনোয়ারাও লজ্জাশীলা, নবীন তপস্বিনী। শামসুল আলমের জন্যে সে গোপনে বোধ করে প্রবল আবেগ; কিন্তু তা প্রকাশ করে না। এ-দুজনের প্রেমকে লেখক অভিহিত করেছেন 'হুরী ফেরেশতার প্রেম' বলে। মনোয়ারার সৌন্দর্যেও দশদিক আলাকিত, সকলেরই চিত্ত জয় করেছে ওই অনিন্দ্য রূপসৌন্দর্য। মনোয়ারার 'নবনীত চারুঅঙ্গ'কে 'বহুমূল্য বস্ত্র ও রত্মাভরণ' 'স্বর্গীয় সুষমা দীপ্ত' করে তোলে। তার 'কমল কান্তি'র 'সোন্দর্য জ্যোতি' সকলের 'চক্ষু ঝলসিত ও মনপ্রাণ বিভোর' করে দেয়। সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে, 'এমন রূপমাধুরী আমার জীবনে কখনও দেখি নাই। এ যে পরীর রানী বেহেশতের অপূর্ব্ব হুরী প্রতিমা'। ওই হুরীর নৈকট্য লাভ করে শামসুল আলমের সঙ্গে সঙ্গে লেখকও হতবিহ্বল হয়ে ওঠেন। মনোয়ারার রূপবর্ণনা করতে করতে লেখক নিজেই সম্পন্ন করে দেন মনোয়ারাকে সম্ভোগের কাজটি; 'আহা! কি সে রূপের ঝলক! যেন শত চাঁদের শত সুষমা মনোয়ারার মুখমণ্ডলে নিহিত রহিয়াছে। সে রূপের দীপ্তোজ্জ্বল জ্যোতিতে মুহূর্তে কক্ষটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল'। রূপের ঝলকে ওই নারী পুরুষপ্রভুকে উতলা ও কামাতুর করে তোলে; কিন্তু সে নিজে নিজেকে নিয়ে সংশয়ে ভোগে। কিছুতেই নিজেকে পুরুষপ্রভুর যোগ্য বলে মনে করতে পারে না। শুধু মনস্তাপে দগ্ধ হয়, 'আমায় কি তিনি ভালবাসিবেন ? আমি কি তাহার উপযুক্তা ? কিন্তু উপযুক্তা না হইলেও যে তাহার বিহনে আমি জীবন রাখিতে পারি না। যদি তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আর এ-সংসারে থাকিব না'। নিজেকে নিয়ে একই রকম হীনমন্যতা বোধ করে সুখী হয় আনোয়ারা :

> বালিকা কখনও ভাবে, যিনি নিঃস্বার্থভাবে এ জীবন রক্ষা করিয়াছেন তাঁহারই চরণতলে প্রাণ উৎসর্গ করিলাম; কিন্তু অযোগ্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিলে সে মরমে মরিয়া যাইব। আবার ভাবে- উৎসর্গের বস্তু হেয় হইলেও তা কেহ ফেলিয়া দেয় না; কিন্তু ফেলিয়া না দিলেও যদি মনঃপুত না হয় তবে দিয়া লাভ কি ? না না, উৎসর্গ করাই তো স্ত্রীলোকের ধর্ম, লাভ চাহিবে কেন?

এমন কাতরতা প্রেমিকার নয়, দাসীর। এ- লেখকেরা প্রেমিকার মধ্যেও

দেখতে চেয়েছেন কাতর দাসীকে। প্রেমিকা দাসীর কাতরতা দেখে তুষ্ট হয়েছে প্রভু শক্তিমানের অহং।

সালেহাও মানবী হুরী। তার রূপ তার সৌভাগ্যের মূলে। তার যৌবন প্রেমিক পুরুষকে প্রেমাতুর ও কামাতুর করে তোলে; কিন্তু সালেহা নিজে উদাসীন সন্ন্যাসিনী। সালেহা লেখকের চোখে 'নন্দনের অস্ফুট পারিজাত কলিকা' 'অনাবিল সারল্যের প্রতিমূর্তি।' তার মুখশ্রী 'মনোমোহিনী', অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 'সুগঠিত' ও 'সুন্দর'। সেখানে 'বিনা অঙ্গরাগ ও অঙ্গসংস্কারে দিন দিন যৌবন সুষমার আবির্ভাব' ঘটেছে। তার 'বিম্বাধর ও মুক্তাবিনিন্দিত দন্তরাজি' তে আছে 'কি এক মোহিনী শক্তি'। এই রূপ উন্মাদ করে তোলে নবাব বংশের তরুণকে। ওই তরুণ নিজের অবস্থা ও অবস্থান ভুলে চুরি করে 'একটি গবাক্ষের অন্তরাল হইতে সতৃষ্ণনয়নে অনিন্দ্যসুন্দরী সালেহার রূপসুধা পান' করতে থাকে এবং 'কেবলমাত্র তার অসামান্য রূপ ও গুণ'-এর জন্যেই সালেহাকে ওই যুবক অঙ্কশায়িনী করতে চায়। এভাবে এ-নারীর জন্ম সার্থক হয়ে ওঠে। গরীবের মেয়ে উপন্যাসে নূরী বিবাহ পূর্বকাল থেকেই অন্যদের মতো অসামান্য রূপবতী না হলেও, বিয়ের অনতিকাল পরেই তার রূপান্তর ঘটে। সে হয়ে ওঠে ঈর্ষণীয় সুন্দরী। কেননা সে লাভ করে এক নব্য আদম পতি; শিক্ষিত, ধর্মাচ্ছন্ন, চাকুরিজীবী। ওই পরশ পাথরের পরশে নিকৃষ্টা নূরী হয়ে ওঠে উৎকৃষ্টার অধিক উৎকৃষ্টা; সকলেই যাকে ঈর্ষা করে। নূরীর স্বামী তাকে বেশ করিয়া সাজাইয়া' স্কুলে পাঠায়। শুধু পরিচ্ছন্নতাপ্রীতির কারণে পতিপ্রভু এমন করে তা নয়। অন্য সকলের চেয়ে নিজের ভিন্নতা ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের কোনো সুযোগই নব্য আদম কখনো হারাতে চায় না। নিজেকে জাহিরের সুযোগটির সদ্ব্যবহার করার জন্যেই নূর মোহাম্মদ নূরীকে 'বেশ করিয়া সাজাইয়া' সামাজিক সমাবেশ পাঠায়। নূরীর সজ্জা এমন :

> তাহার উঁকুনের বাসা বিশৃঙ্খল চুলের রাশি এমন পরিপাটি বিনানভাবে খোঁপা বাঁধা যে সেরূপ চমৎকার চুলের খোঁপা পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কখনো দেখে নাই। তাহার কর্ণে গিনি স্বর্ণের সমুজ্জ্বল পার্শি মাকড়ী, কণ্ঠে হার, হাতে সোনার চুড়ি, পরিধানে জবারঙ্গের সেমিজের উপর জরি পেড়ে নীলাম্বরী শাড়ি, পায়ে জরির জুতা।

'এই অল্পমাত্র বেশভূষার পরিধান পারিপাট্যে নূরীকে এমন সুন্দর দেখাইতেছে যে, উপস্থিত অষ্টালঙ্কার ভূষিতা পরীর ছুরত ছাজেদার রূপগৌরব নিষ্প্রভ' হয়ে যায়। নূরী দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। কারণ নব্য আদমের সঙ্গে পরিণীতা হবার সৌভাগ্য হয়েছে তার। ওই সৌভাগ্যই তাকে অকস্মাৎ 'সুশ্রী' ও 'মনোমোহিনী' করে তুলেছে: যারা ওই সৌভাগ্য অর্জন করতে ব্যর্থ, তারা শ্রীসম্পন্ন হয়েও নিষ্প্রভ।

নতুন বিবি : অতি গুণবতী, তুলনাহীনা

যা কিছু উত্তম তার সমষ্টি হচ্ছে নতুন বিবি। তার শরীরে আছে বেহেশতী হুরের 'যৌবন সুধা', তার স্বভাবে আছে অতুলনীয় নম্রতা, আর অতি মেধাবী সে। চরাচর যেমন তার রূপের স্তবে মুখর; তেমনি তার স্বভাব ও ধীশক্তির সৌন্দর্যে অভিভূত। আনোয়ারা, নূরী, মনোয়ারা, সালেহা- এই রূপসী নতুন বিবিরা সকলেই 'সুশিক্ষিতা', প্রত্যেকেই মেধাবী। লেখকেরা 'সুশিক্ষা' বলতে বুঝেছেন পাঠশালার শেষ ধাপ পর্যন্ত পড়াশোনা করাকে বা 'ছাত্রবৃত্তি পাস' করাকে। নতুন বিবিরা কেউই 'ছাত্রবৃত্তি পাস'-এর অধিক লেখাপড়া করার কথা ভাবতেও পারে না, কারণ নব্য আদমই তা ভাবার সাহস পায় না। ওই 'পাস' দেয়ার পর্যায়ে পৌছুবার সময়ের মধ্যেই তারা পৌঁছে যায় পুরুষতন্ত্র নির্দেশিত নারীর পরম তীর্থ- পতিগৃহে। নব্য আদম রূপসীকে কামনা করেছে; আবার শুধু রূপে তার মন ভরে নি, রূপসীর মধ্যে চেয়েছে অতিগুণবতীকে। নতুন বিবির গুণের কোনো শেষ নেই। যে বিদ্যাই সে আয়ত্ত করতে চেয়েছে তাতেই সে হয়ে উঠেছে সেরাদের মধ্যে সেরা– সবকিছুতেই সে লাভ করেছে অশেষ সিদ্ধি। তবে এর কোনো কিছুই তার নিজের জন্যে নয়। তার শরীর ও সৌন্দর্য যেমন সার্থক হয়ে পুরুষপ্রভুর ভোগের কাজে লেগে, তেমনি তার শিক্ষা বা বিদ্যার্জনও পুরুষপ্রভুর জন্যে। পতিপ্রভু পরম গৌরবের সাথে 'বিদুষী' স্ত্রীর ধীশক্তি ও গুণাবলীর কথা বন্ধুবান্ধবকে শোনায়; শুনিয়ে অন্য সাধারণ সকলের চেয়ে নিজেকে মর্যাদাসম্পন্নরূপে প্রতিপন্ন করে। আর বিবি তার বিদ্যা ও অন্যান্য গুণাবলী নিয়ে চিরকালের জন্যে প্রবেশ করে প্রাচীরবেষ্টিত অন্তঃপুরে; হয়ে ওঠে অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্যা চির অনুগতা দাসী। তাকে গুণবতী হতে হয় পতির সংসারকে সুচারুরূপে গুছিয়ে রাখার যোগ্যতাসম্পন্ন হবার জন্যে। তার বিদ্যাশিক্ষা নিজের জীবনকে আলোকিত করার জন্যে নয়, এটি দরকার নব্য আদমের বিবি হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে। বিদ্যাশিক্ষা গুণবতী বিবি হবার অত্যাবশ্যক উপাদান মাত্র। নতুন বিবিরা সকলেই কিশোরী; কিন্তু তাদের ভেতরে বাস করে প্রবীণ পিতামহী– নবীনার ভেতর থেকে কথা বলে ওঠে অতি প্রবীণা– যার আছে ঈশ্বরে প্রবল বিশ্বাস; কোনো বিপদ তাকে বিচলিত করে না, বরং সকল অবস্থায়ই

সে থাকে অটল। সঙ্কটে সম্পদে কখনোই তার উচ্ছ্বাস উপচে পড়ে না।

আনোয়ারা প্রত্যন্ত পল্লীর কিশোরী। কিন্তু তার জ্ঞানপিপাসা সীমাহীন। হিংসাদ্বেষভরা সংসারে সে বাস করে জ্ঞানপিপাসু সাধকের মতো। তবে এই জ্ঞানপিপাসা একেবারেই উবে যায় বিয়ের পর, তখন সে সাধনা করে পতি অনুগতা সতী নারীর সতীত্বের তেজ প্রকাশের। আনোয়ারার বয়স বারো বছর। সকল বিষয়েই সেরা সে; আনোয়ারা 'যেমন সুন্দর তাহার স্বভাবটিও তেমনি মনোহর, আবার পড়াশুনায় আরো উত্তম'। ওই বয়সেই ধৈর্যশক্তি, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতায় সে ধরিত্রীর মতো। সে সৎ মায়ের সংসারে বাস করে নানা গঞ্জনা সহ্য করে। সৎ মা তাকে 'দিনরাত খাটায় আর তিরস্কার করে'। কিন্তু আনোয়ারার মনে কোনো ক্ষোভ, দ্বেষ জাগে না। গুরুজনকে সে শ্রদ্ধা করে তার মনপ্রাণ উজাড় করে। সে 'তার সৎ মার অত্যাচার নীরবে সহিয়া তারই আদেশ উপদেশ মতো চলে, টু শব্দটি পর্যন্ত করে না; বরং কেহ নিন্দাবাদ করিলে সেখানে হইতে উঠিয়া যায়।' সে গঞ্জনা ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য করে গৃহস্থালীর কর্ম সম্পন্ন করে। গৃহস্থালীর কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে জানে সে; তাকে শেখানো হয়েছে এটিই নারীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাকে এটি শেখায় তার পিতামহী। 'ভূঞা সাহেবের ধর্মশীলা বুদ্ধিমতী জননী এই ১২ বৎসরের কন্যাকে যেভাবে গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন সচরাচর সেরূপ যায় না'। 'ধর্মীয় শিক্ষা' এবং 'বাংলা শিক্ষা' দুইই সে আয়ত্ত করেছে কৃতিত্বের সঙ্গে। সে আরবি, ফারসী ভাষায় দক্ষ; বালিকা বয়সেই আনোয়ারা 'কোরান শরীফ, মেফতাহুল জান্নাত, রাহে নাজাত, পান্দো নামা, গোলেস্তাঁ প্রভৃতি আরবী, ফারসী ও উর্দু কেতাব তাহার দাদিমার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল।' তাই অন্য সাধারণ বাঙালি বালিকা যা বুঝতে অসমর্থ, আনোয়ারা তা বুঝে ফেলে অতি সহজেই। 'আরবী মিশ্রিত উর্দু উচ্চারিত' মোনাজাত দূর থেকে শুনেও সে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

'আনোয়ারার স্মরণশক্তি অসাধারণ:, পাঠ্যবিষয় সে অনায়াসে মুখস্থ করে ফেলে। 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ভূগোল পাঠ, ভারতের ইতিহাস আদ্যন্ত মুখস্থ' তার। সাহিত্যবোধ তার অসামান্য, পাঠ্য যেকোনো গ্রন্থের যেকোনো অংশের ব্যাখ্যা সে সুচারুরূপে লিখে উঠতে পারে, 'চারুপাঠ, সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্য পাঠ প্রভৃতি সাহিত্যপুস্তক সুন্দররূপে বুঝাইয়া লিখিতে পারে'। নিজেদের বৃত্তির টাকা দিয়েই সে নিজের 'কাপড়-চোপড় পুঁথি পুস্তকের' 'কষ্ট' দূর করতে সক্ষম। তার সেলাইয়ের হাতও চমৎকার এবং বিদ্যালয়ের পরিদর্শককেও সে সেলাই নৈপুণ্যে চমৎকৃত করে পুরস্কার লাভ করে। তার 'জামা সেলাই, নীলাম্বরী কাপড়ে ফুল তোলা দেখিয়া' স্কুলের ইন্সপেক্টর সাহেব তাকে '১০ টাকা পুরস্কার' দেন। শুধু পাঠ্যগ্রন্থই সে নিবিষ্টভাবে পাঠ করে না।, হিতৈষী গুরুজনেরা অন্য যেসব গ্রন্থ পাঠ

করার নির্দেশ দেয় সে তাও মনোযোগের সঙ্গে পড়ে ফেলে। তাই পাঠ্যবইয়ের বাইরে '২০/২৫ খানি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক' সে 'সুন্দররূপে আয়ত্ত' করে ফেলে। তার এই 'জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া' বিদ্যালয়ের শিক্ষকও অভিভূত হয়ে যান। তার অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি এমন ঃ 'মেয়ের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি'। শুধু জ্ঞানপিপাসুই নয় আনোয়ারা, তার মতো সুমধুর করে কোরান পাঠও করতে পারে না অন্য নারী। তার শিক্ষকের স্বীকারোক্তি ঃ 'আনোয়ারার কোরান পাঠ শুনিলে আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না।'

সে তার বৃত্তির টাকার অধিকাংশ ব্যয় করে বই কেনার জন্যে। অন্য নারীরা যেখানে 'সুগন্ধি তেল' ও বিলাসিতা'র জন্যে ব্যাকুল, আনোয়ারা সেখানে ইসলামের মহৎ পুরুষদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠের জন্যে উদগ্রীব। সে বহুপুস্তক পাঠ করেও অতৃপ্ত। সে আরো পড়তে চায়; তাই হযরত ওমরের জীবন চরিত কিনে দেয়ার জন্যে শিক্ষকের কাছে টাকা দিয়ে আসে। দাসীর মতো গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন করেও ক্লান্ত হয় না। সন্ধ্যাগুলো কাটায় উচ্চভাবসম্পন্ন গ্রন্থ পাঠ করে। সে খুবই ধর্মশীলা। 'মাগরেবের নামাযের পর' সে সময় কাটায় গ্রন্থ পাঠ করে। এ-সময় সে পড়তে পছন্দ করে হযরতের জীবনচরিত-এর মতো উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন গ্রন্থ। গ্রন্থপাঠের মতো সুখকর আর কিছু নেই তার জীবনে। বই পড়তে পড়তে সে এতোই বিভোর হয়ে যায় সে ক্ষুধা-তৃষ্ণাবোধ তার লোপ পায়। তাই ঠিক সময়ে 'রান্না ঘরে যাইয়া ভাত' খাওয়া তার হয়ে ওঠে না। ওই বিলম্ব সৎমাকে ক্ষিপ্ত করে এবং আনোয়ারাকে শুনতে হয় 'অকথ্য ভাষার গালি'। আনোয়ারা নীরবে সহ্য করে এবং সহ্য গুণে সে হয়ে ওঠে মহীয়ষী। 'গালাগালির ঘেন্নায়... মনের কষ্টে উপোসে রাত কাটায়'। তবে এই কষ্ট সহ্য হচ্ছে মহাকষ্ট সহ্যের প্রস্তুতি মাত্র, এভাবে তাকে তৈরি করে নেয়া হচ্ছে চরম অগ্নিপরীক্ষার জন্যে- সতী নারীর অগ্নিপরীক্ষা। প্রস্তুতিকালীন পরীক্ষাগুলো উত্তীর্ণ হতে শেখে বলেই আনোয়ারা চরম পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হতে পারে কৃতিত্বের সাথে।

রন্ধন বিদ্যায়ও আনোয়ারার পটুত্ব ঈর্ষণীয়। বালিকা বয়সেই সে হয়ে ওঠে পাকা রাঁধুনি। বারো বছর বয়সেই সে রান্নায় এমন দক্ষতা অর্জন করে যে, বাড়িতে 'বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইলে আনোয়ারাকেই পাক করিতে' হয়। তার রান্না মুহূর্তে চিত্ত জয় করে নেয়। তার হাতে প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রীর সুস্বাদুতাও নূরুল এসলামের চিত্তকে প্রেমাবেগে ভরে তোলে। আহারান্তে নূরুল এসলাম ও তার অধঃস্তনদের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া জাগে :

> পাচক নৌকায় যাইয়া কহিল, পাকের বড়াই আর করিব না, এমন পোলাও-কোর্মা জন্মেও খাই নাই। আকবরী পোলাওয়ের নাম গন্ধে

> শুনিয়াছিলাম; আজ তাহা পেটে গেল। যাচনদার কহিল, খুব বড় আমীর ওমরাহ লোকের বাড়িতেও এমন পাক সম্ভব না। নূরুল এসলাম কহিলেন, তোমাদের কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না, পাক বাস্তবিকই অনুপম হইয়াছিল।

আনোয়ারার আছে গভীর ঈশ্বরভক্তি। মহাসঙ্কটেও সে থাকে অবিচল। লম্পট বদমাশের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে গেলেও সে ভয়ে কাতর হয় না, বরং গভীরভাবে বিশ্বাস্ করে যে, তাকে ঈশ্বর রক্ষা করবেন। পিতামহীর সঙ্গে তার কথোপকথন এমন :

> আনোয়ারা কহিল। আর একজন ঠেকাইবে।
> বৃদ্ধা। কে সে ?
> আনোয়ারা। আমরা ওজু করিয়া এতক্ষণ যাঁহার নাম করিলাম।

এখানে কিশোরীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে পিতামহীর প্রবীণ কণ্ঠস্বর। প্রভু পুরুষ নবীনার দেহে এমনই বশংবদ প্রবীণাকে পেতে চায় বলেই আনোয়ারা এমন।

একই রকম নবীনা ধর্মশীলা ও ধীমান মনোয়ারা। আনোয়ারার বয়স বারো বছর কিন্তু মনোয়ারা আরো বালিকা। মনোয়ারার বয়স নয় বছর, তবে 'সে এই নয় বৎসর বয়সের মধ্যে পবিত্র কোরান শরিফ সম্পূর্ণ শেষ করিয়াছে'। শুধু তাই নয়, এই বয়সেই সে তার 'পিতামাতার দেখাদেখি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পাঠ আরম্ভ করিয়াছে।' পড়াশুনার প্রতিও তার অনুরাগ প্রবল। 'দৈনন্দিনের পাঠ সে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে'। মনোয়ারা বিদ্যা অর্জন করে নানা বিষয়ে, খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে। সে সুমধুর কণ্ঠে কোরান পাঠ করতে পারে। 'তাহার কোরান পাঠ শুনিলে' অন্য কাহারো কোরান পাঠ' 'ভাল লাগিবে না'। সে 'পান্দেনামা', 'রাহে নাজাত', 'মেফতাহুল জান্নাত', 'গোলেস্তা' 'উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছে'। 'সাহিত্য, গণিত, ভূগোল এবং ইতিহাসেও সে সুশিক্ষিতা'। 'হাদিস শাস্ত্রেও' সে অসাধারণ 'ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে'। এখানেই তার গুণের শেষ নয়। 'সুচীশিল্পেও সে বিশেষ পারদর্শিনী'। 'তাহার হাতের ফুল তোলা' রুমাল মনকে মোহিত করে। 'রুমালাদিতে লতাপাতা ও ফুলাদি অঙ্কিত করিয়া' সে সকলকে 'চমৎকৃত' করে। 'রন্ধন বিদ্যার পটুতা'ও তার অসামান্য। মেধা ও নিষ্ঠা দিয়ে সকল বিষয়ে সে অন্য সকল বিদ্যার্থীকে ছাড়িয়ে যায়। সে সর্বদা 'সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার' করে, আর 'তাহার শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিয়া' তার 'ওস্তাদ মাতা' 'গৌরব অনুভব' করে। মনোয়ারা অতি ধনীর কন্যা কিন্তু তার তুল্য সুশীলা বিরল। 'অত্যধিক স্নেহাদরে সন্তান-সন্ততি সচরাচর যেমন অসভ্য অপদার্থ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে, মনোয়ারা তেমন নহে। সে কখনও পিতামাতার অবাধ্য হয় না'। লেখক এই গুণবতীর

প্রশংসা করেন এভাবে :

> কেবল শিক্ষাদীক্ষায় ও ধর্ম্মেকর্ম্মে বলিয়া নহে, আদব-কায়দাও তাহার অতি চমৎকার। তাহার শিক্ষা সভ্যতা ও ভব্যতা যে দেখে সেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রতিবেশীগণ সকলেই তাহার অপ্রবিস্তর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না।

এই নতুন বিবিরা প্রত্যেকেই একা। আর দশজন সাধারণ নারীর মতো অনেকের সঙ্গে সহজভাবে বেড়ে ওঠে না তারা। তারা বেড়ে ওঠে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গভাবে–বর্ষীয়ান কারো তত্ত্বাবধানে। আনোয়ারা যেমন বেড়ে ওঠে বৃদ্ধ পিতামহীর তত্ত্বাবধানে; মনোয়ারারাও তেমনি বেড়ে ওঠে প্রবীণ শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে, পিতার তৈরি ছাঁচমতো। তার পিতা 'কন্যা মনোয়ারাকে কোন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নাই'। 'স্ত্রী শিক্ষায় অমনোযোগী' বলে কন্যাকে ঘরে আবদ্ধ রাখে নি পিতা। বরং 'স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী' পিতা। তা সত্ত্বেও কন্যাকে স্কুলে না পাঠাবার পেছনে আছে পিতা প্রভুর মহা শুচিবায়ুগ্রস্ততা। লেখক ওই শুচিবায়ুগ্রস্ততার এমন বর্ণনা দেন :

> কন্যাকে স্কুলে না পাঠাইবার কারণ, ঐ সকল বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর বালক-বালিকাই অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সকল বালিকার স্বভাব সমান নহে। কোন কোন বালিকার চরিত্রদোষ থাকাও অসম্ভব নয় এবং তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া মনোয়ারার স্বভাব মন্দ হইয়া যায়, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সওদাগর সাহেব কন্যাকে কোন বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন নাই।

তবে 'কন্যার শিক্ষার জন্য' এক 'গরিয়সী মহিলাকে সর্বাংশে উপযুক্তবোধ করিয়া' 'তিনি কন্যার শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন'। মনোয়ারা একেবারেই গর্বশূন্য, নিভৃতবাসী, লজ্জাশীলা বালিকা। সকল বিদ্যায় মহাপারদর্শী হয়েও গর্বে ফেটে পড়ে না সে, এমন কী পিতামাতাকেও সে বুঝতে দেয় না যে, 'সে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন উন্নতি লাভ করিয়াছে'। কন্যার 'অসামান্য বিদ্যাবত্তার কথা শুনে পিতামাতার 'যারপরনাই আনন্দ অনুভব' করতে থাকে। আর এতো গুণ মনোয়ারা আয়ত্ত করে অপেক্ষা করে পতিপ্রভুর জন্যে।

গুণবতী সালেহাও অতি ধার্মিক, নম্র এবং বিদ্যা অর্জনের জন্যে ব্যাকুল। সে হেমায়েল শরীফ যেমন পড়তে পারে, তেমনি পড়তে পারে কুরআন শরীফ। উর্দু ও পার্সী ভাষাও তার আয়ত্তে, উর্দু সে লিখতে পারে, উর্দু ভাষায় সে পড়ছে উর্দু কি তিসরি, মৌলুদের কেতাব। পার্সী কি পাহলি কেতাব সে নিজে নিজে পড়া শুরু করে। সে কোরান পাঠ করে অতি সুললিত কণ্ঠে। তার কোরান পাঠ শুনে প্রবীণ মৌলভী

চমৎকৃত হয়ে এমন প্রশংসা করে ঃ 'তুমি কোরআন শরীফ বেশ পড়তে পারো'। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সালেহার মেধা আরো প্রখর হয়, তার গুণ আরো বিকশিত হয় ক্রমশ। 'উর্দু ভাষায় লিখন, পঠন ও কথাবার্তার তো কথাই নাই, পার্সী ভাষাতেও' সে বেশ অগ্রসর হয়। সে অন্তঃপুর বাস করেও নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে মাদ্রাসার উলা পরীক্ষায় সকল ছাত্রকে ডিঙিয়ে যায় এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সেও মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পায় এবং 'মাদ্রাসার পুরস্কার বিতরণকালে তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত' করা হয়। তার মেধা শুধু তার গৃহশিক্ষককেই চমৎকৃত করে না, মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্টকেও বিস্মিত করে। অন্য লেখকদের নব্য বিবির চেয়ে সালেহার যোগ্যতা বেশি। অন্য বিবিরা যা পারে না, সালেহা তা পারে। সে মৌলুদ পাঠ করতে পারে। সে এমন 'মধুকণ্ঠে' কোরআন তেলওয়াতের সঙ্গে সঙ্গে 'সুললিত কণ্ঠে' 'সরলভাবে রেওয়ায়েত (ধর্মোপাখ্যান)' পাঠ করে যে, 'সমবেত মহিলামণ্ডলী নিষ্পন্দভাবে একমনে মৌলুদ শ্রবণ' করতে থাকে। সকলে তার গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হয়, সে বালিকা হয়েও হয়ে ওঠে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী।

নূরীও শুদ্ধরূপে কোরান পড়তে জানে, তার মুখস্থ আছে গুরুত্বপূর্ণ দোয়াদরুদ, জানে নামাজ পড়ার বিধি। একই সঙ্গে তার মুখস্থ আছে উচ্চভাবসম্পন্ন নানা পদ্য। সে জানে সূচিকর্ম ও রন্ধন। হাদিস কালাম তার কণ্ঠস্থ, মহৎ পুণ্যবতী নারীদের জীবন বৃত্তান্ত তার জানা। সে পাঠশালায় বাংলা নানা পুস্তক পাঠ করেছে। পড়েছে 'মেঘনাদবধ কাব্য; সীতার বনবাস, চারুপাঠ ৩য় ভাগ ও কবিতাবলী'। পাঠশালায় নানা গুণের কারণে সে পুরস্কার পায়। সব বিষয়েই সেরা সে এবং নানা সময়ে নানা বিষয়ে বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করে। 'সাহিত্য ও শ্রুতি লিখন শুদ্ধ হওয়ার নগদ ২০ টাকা' পুরস্কার লাভ করে সে। সে 'হাতের লেখায় পাঁচখানি লেখার খাতা ও একখানি এটলাস' পুরস্কার পায়; তার 'সেলাই দেখিয়া ও কবিতা মুখস্থ বলায়' স্কুল দেখতে আসা 'এক মেম সাহেব' 'একখানি বোম্বে শাড়ি পুরস্কার দেন।' নানা রকম পদ্য নূরীর কণ্ঠস্থ। সে জানে ঈশ্বর প্রশস্তিমূলক পদ্য, নারীর আত্মোৎসর্গের মহিমা ও নারীজাতির শিক্ষাবিষয়ক পদ্য। নূরীর 'সর্বাপেক্ষা মনমতো' কবিতাটি হচ্ছে :

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মত সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও
পরের সুখের তরে নিজ সুখ যে পাশরে
সেইসে মানুষ হয় এই ধরাতলে।

নূরীর মুখস্থ বিদ্যার পরিচয় পেয়ে তার স্বামী 'নূর সাহেবের হৃদয় আহলাদে নৃত্য করিতে থাকে'। তার চিত্ত 'একান্ত হর্ষবিহ্বল' হয়ে ওঠে। কেননা 'কবিতার মধ্য দিয়া' পতিপ্রভু নূরীর 'হৃদয়' চিনতে পেরেছে। নূরীর স্বামীর চিত্ত পুলকে গদগদ :

> প্রাণাধিক প্রিয়তমে-তোমার মুখে অশ্রুতপূর্ব মধুময় কবিতা শুনিয়া ও কবিতার মধ্যে দিয়া তোমার হৃদয় চিনিয়া আজ যেরূপ আনন্দ লাভ করিলাম, জীবনে এইরূপ আনন্দ লাভ কখনো ঘটে নাই।

এ-আনন্দের অন্য নাম শক্তিমান প্রভুর লাভবান হবার উল্লাস। তাই পতিপ্রভু যখন বলে, 'তোমাকে বিবাহ করিয়া আমার জীবন সার্থক হইয়াছে'; তখন সে আসলে জানায় অন্য সকলের চেয়ে তার অনেক বেশি লাভবান হবার তথ্যটি।

নানা রকম নতুন বিবি

যে-প্রথাটি মানব সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত এবং বহুদিন থেকেই যে প্রথাটি আবেদনশূন্য ও জরাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে তার নাম বিবাহ। নব্য আদম এ-উপন্যাসগুলোতে ওই প্রথার মহিমা বৃদ্ধির জন্যে চালিয়েছে ব্যাপক প্রচারণা। বাস্তবে তার চারপাশে সে দেখেছে ওই প্রথাটির মহিমাহীনতা ও ব্যর্থতা। প্রথাবদ্ধ মানব-মানবী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নয়, শ্রদ্ধাশীল; কারো প্রতি কারো মনোযোগ নেই, কারো সঙ্গে কারো নেই হার্দ্য ও নিবিড় মানসিক যোগাযোগ। এটি শুধু নব্য আদমের কালেরই অবস্থামাত্র নয়, ওই প্রথাটি এই বর্তমানেও একই রকম নীরক্ত ও ক্লান্তিকর। প্রথাবদ্ধ নরনারী ওই প্রথা পালন করে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের মতো যান্ত্রিকভাবে এবং কোনো মানসিক আবেগের চাপ বোধ না করে। নব্য আদম দেখেছে তার চারপাশের নরনারীর জীবনে বিবাহের ব্যর্থতা। বিবাহিত নরনারী প্রথার জোরে পরস্পরের প্রতি চালায় স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রকাশ্য ও গোপন নানা পীড়ন ও শাসন এবং ওই বিবাহিত জীবন গ্লানি ও নিরর্থকতার সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। এ অবস্থা নব্য আদমকে পীড়িত করেছে এবং পুরুষতন্ত্রের চিরবিশ্বস্ত অনুগত অনুচর হিশেবে তারা ওই দুরবস্থা ঘোচাতে অতি তৎপর হয়ে উঠেছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রধান ও গৌণ সকল সৃষ্টিশীল রচনায়ই বিবাহ নামক প্রথাটির নীরক্ততার নানারূপ উঠে এসেছে। তাঁরা সকলেই বেশ ভালোভাবে দেখেছেন যে, প্রথাটি কেমন আবেদনহীন ও বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁরা তা স্বীকার করতে খুবই ভীতি বোধ করেন। তাঁরা কপট বলেই ওই প্রথাটিকেই পরম গন্তব্য ও রমণীয় আশ্রয় রূপে নির্দেশ করতে থাকেন; তাঁদের অনেকে এ-প্রথাকে গণ্য করেন স্বতঃসিদ্ধ শাশ্বত ব্যাপার রূপে। নব্য আদমও প্রথাবিশ্বাসী এবং প্রথায় গভীর আস্থাশীল। তবে তাঁরা তাদের চারপাশে ওই প্রথাটির জীর্ণদশা প্রকটিত হয়ে উঠতে দেখেছে। ওই জীর্ণতা তাদের বিচলিত করে এবং ওই জীর্ণতা দূরীকরণের জন্যে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। তারা পুরুষতন্ত্রের অন্ধ অনুচর বলেই তাদের মনে হয় বিবাহের জীর্ণদশার মূলে রয়েছে নারী।

এই সৃষ্টিশীল নতুন আদম ও তাঁদের নায়কেরা বিশ্বাস করে যে বিয়ে জীবনের

খুবই বড়ো ব্যাপার; 'বিবাহ যাবজ্জীবনের সম্বন্ধ। মানবজীবনের সুখদুঃখ অধিকাংশকাল এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে।' তাঁরা এও বোধ করেন যে, নারীর কারণে জরাগ্রস্ত এ-প্রথার জীর্ণদশা ঘোচাতেও হবে নারীকেই। তবে চারপাশের সাধারণ নারীর কাজ নয় এটি; তাঁরা কিছু অসাধারণ নারীর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন এ- কাজের জন্যে। তাঁরা বিশ্বাস করেন এ- প্রথাটিকে নবপ্রাণ দেয়া সম্ভব শুধুমাত্র নারী যদি বশমানা, অনুগতা, আত্মলোপকারী, মূক ও পরহেজগার হয়ে ওঠে, তবে। এ-প্রথার পচনগ্রস্ততার জন্যে পুরুষ দায়ী নয়, দায়ী পাপিষ্ঠা নারী। পুরুষ স্বভাবতই গুণবান, কিন্তু নারীকে গুণ আয়ত্ত করতে হবে। তাঁরা বিশ্বাস করে শুধু নারীর গুণেই সংসার সুখের হতে পারে। নারীর কাজ সংসারকে নানাভাবে সুখে ভরে তোলা। এ-উপন্যাসগুলোতে দেখা যায় নব্য আদম ও নতুন বিবির বিবাহিত জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের। এ- উপন্যাসগুলোতে লেখকেরা জরাগ্রস্ত প্রথাটিকে নবযৌবন দেবার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়েছেন। তাই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রচনা করতে হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন সুখের রোমান্স। তাঁরা সমাজের নানা মানুষের জীবনের উদাহরণ তুলে দেখান যে কীভাবে শুধু নারীর কারণেই বিবাহ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। তবে নারী যদি পুরুষতন্ত্রের নির্দেশিত বা বলা ভালো পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি নব্য আদম নির্দেশিত ছাঁচমতো নিজেকে তৈরি করে নেয় তবে বিয়ে চিরসুখময় হয়ে উঠবে। ওই প্রথাটির মহিমা ফিরিয়ে আনার জন্যে নানারকম নতুন বিবির ছাঁচ তাঁরা তৈরি করেন।

আনোয়ারা, মনোয়ারা, নূরী, সালেহা ওই ছাঁচ মতো তৈরি নতুন বিবি। এদের কেউ অতি সতী। এই বিবি চরাচরকে জানায় পতির জন্যে জীবন বিসর্জন দেয়া এবং সতী হওয়াই হচ্ছে নারীত্ব। কেউ অতিবিদুষী, তবে সেও অবশ্যই একনিষ্ঠ সতী। তবে সতীত্বের তেজ দেখানোই তার একমাত্র কাজ নয়; পতিকে তুষ্ট করতে হয় তাকে তার শিক্ষা, পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে। তার পাণ্ডিত্যের ঝলকে পতি ও পতিকুলের সকলে অভিভূত হতে চায় বলেই নতুন বিবি বিদুষী হয়ে ওঠে। তার বিদ্যার্জন তার নিজের জন্যে নয়; পুরুষ ওই রূপেও তাকে দেখতে চায় বলেই সে এমন হতে বাধ্য হয়। কোনো কোনো নতুন বিবি মূক গৃহপরিচারিকা। নতুন আদম তাকে গণ্য করে 'আদর্শ রমণী' বলে। সেও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না ও তেজী সতী, তবে এক্ষেত্রে তার নিঃশব্দ পরিচারিকা রূপটিকেই মহিমান্বিত করে তোলা হয়। নিঃশব্দ বাঁদী সংসারের সব কাজ করে নিজ হাতে; অন্য সতী বিবিরাও করে; তবে এই বিবি সকলের চেয়ে বেশি করে। সবকিছু সে নিজে গোছায়, সামলায়, লেপে, ঝাড়ে, মোছে, রাঁধে, বাড়ে, তুষ্ট করে ও নীরবে সহ্য করে। সংসারের খরচ কমাবার জন্যে সে সবজি-আনাজ বোনে, হিশাব করে পয়সা খরচ করে এবং সকল ব্যয়ের হিশাব রাখে। নারীর এই ভূমিকাই শ্রেষ্ঠ ভূমিকা এবং শুধু এভাবেই তার

জন্ম সার্থক হয় এমন অপবিশ্বাস নারীর মনে দৃঢ়মূল করে দেয়ার জন্যে লেখকের নানা কৌশলের সাহায্য নেন। তাঁরা নারীর সামনে নানা রকম টোপ ফেলেন; আঁকেন নানা লোভনীয় প্রাপ্তির ছবি। তাঁরা দেখান এমন নারী সকলের মাননীয়া; সকলেই তার প্রশংসায় মুখর, অতি শত্রু তার কাছে পরাভব মানে; সে সতী বলে তার স্বামীভাগ্য ভালো, ধনসম্পদের তার কোনো অভাব হয় না, সকলেই তার বশীভূত, এমনকী পরকালে তার জন্যে বেহেশত পর্যন্ত সুনিশ্চিত হয়ে আছে। লেখকেরা তাঁদের গ্রন্থে তুলে ধরা নতুন বিবিদের জীবনকে দৃষ্টান্ত হিশেবে ব্যবহার করেন এবং ওই রকম বিবি হয়ে ওঠার জন্যে প্রলুব্ধ করেন সকল নারীকে। বাস্তব সংসারে এমন দোষশূন্য কলুষমুক্ত অতিমানবিক নারীর কোনো অস্তিত্ব দেখা না গেলেও এ- উপন্যাসগুলোতে রূপায়িত হয়েছে হিংসা, দ্বেষ, ক্ষোভ, ক্রোধ, লোভশূন্য এক গোত্র নারী চরিত্র। নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত এমন অতিমানবিক, মহত্ত্ব পরিপূর্ণ নারী চরিত্র ওই লেখকেরা তৈরি করেন নি। অভিনব রকম শৃঙ্খলিত সেচ্ছাদাসী হয়ে ওঠার উদ্দীপক হিশেবে তাঁরা এমন অবাস্তব নারী চরিত্র সৃজন করেন। এটি নারীকে খঞ্জ, অথর্ব, শৃঙ্খলিত করার আরেকটি কৌশলমাত্র।

সতী সীতা বা পরহেজগার পতিব্রতা সতী বিবি রহিমা

সতীত্বের কারণে অতি প্রসিদ্ধ দুই নারীকে হটিয়ে দেয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন সতী আনোয়ারা। সীতার মতো শুধু কায়মনোবাক্যে পতিভজনা করে এবং প্রতি অনুরক্ত থেকেই সতী হবার ভাগ্য তার নয়। সে সতী বলে তাকে করতে হয় নানা কাজ। সীতাকে দিতে হয়েছিলো একটি অগ্নিপরীক্ষা; আর আনোয়ারা ও অন্য নতুন বিবিদের দিতে হয় অনেক অগ্নিপরীক্ষা। দুটি পুরুষ সীতার জীবনকে দুর্দশায় ভরে দিয়েছিলো- রাম ও রাবণ। পুরুষের অপরিণামদর্শিতা ও ক্ষুদ্রতার কারণেই সীতার জীবনে সঙ্কট আসে। অনুরক্তা নারীকে সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করার সৌজন্য দেখায় নি লক্ষণ; শূর্পনখার আবেগকে উপহাস করেই সে শুধু ক্ষান্ত হয় নি, শূর্পনখাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতও করে সে। শাস্তি লক্ষণের প্রাপ্য হলেও- ইতরতা ও হীনতায় পরিপূর্ণ পুরুষ রাবণ, লক্ষণের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যায় না। সেও নিজের ইতরামো প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। তাই রাম লক্ষণকে জব্দ করার জন্যে সে হরণ করে সীতাকে। লক্ষণের দণ্ড নেমে আসে সীতার ওপর এবং তার বাকি জীবন ভরে যায় লাঞ্ছনার অন্ধকারে। আনোয়ারাকে শুধু সীতত্বের অগ্নিপরীক্ষাই দিতে হয় না; বেহুলার মতো পতিকে রক্ষার জন্যে তাকে বরণ করতে হয় অসহ ক্লেশ। বিবি রহিমার সঙ্গে তার রয়েছে প্রচুর সাদৃশ্য; স্বভাব ও মর্ষকামিতায় দুজনেই অভিন্ন; কিন্তু তার সঙ্কট বিবি রহিমার চেয়েও বেশি এবং শুধুমাত্র সতীত্বের জোরে সে সব সঙ্কট পেরিয়ে আসে। লেখক জানান, শুধু সতী বলেই নানা অসাধ্য সাধন করা আনোয়ারার পক্ষে সম্ভব হয়েছে; তাই সকল নারীকে সবার আগে হতে হবে প্রবল সতী। মোহাম্মদ নজিবর রহমান গ্রন্থের শুরুতেই স্বরচিত যে-পদ্যটি মুদ্রিত করেছেন তা এমন :

সতীর সর্বস্ব পতি
সতী শুধু পতিময়
বিধাতার প্রেমরাজ্যে
সতত সতীর জয়।

এ পদ্যটি জ্ঞাপন করে নারী সম্পর্কে লেখকের মনোভাব ও বিশ্বাস। নারী তাঁর কাছে শুধু ছায়া, পতির ছায়া। ওই ছায়ার একমাত্র কাজ একটি পুরুষের জন্যে

নিজেকে প্রস্তুত করা এবং বহু লোলুপ পুরুষের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। আনোয়ারা উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে একটি সতীর সতীত্বের জোরে পতিকে রক্ষার ও নিজের সতীত্ব রক্ষার শিহরণ জাগানো আখ্যান। বিবি রহিমার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে নি, কিন্তু আনোয়ারার সতীত্ব নিয়ে পতিপ্রভুর মনে গভীর সংশয় দেখা দেয়। বিবি রহিমার সপত্নী ছিলো, কিন্তু সপত্নীদের পীড়ন তাকে সহ্য করতে হয় নি। কারণ সে সেবা দিয়ে সহজেই তাদের তুষ্ট করতে পেরেছিলো। আনোয়ারার সতীন নেই; আছে সৎশাশুড়ি, যাকে সেবা-ভক্তি দিয়ে কোনোক্রমেই তুষ্ট করা সম্ভব হয় না। তাই আনোয়ারা সহ্য করে অন্য সতীদের থেকে বেশি পীড়ন, সৎশাশুড়ির পীড়ন; আর সতীত্বে ছাড়িয়ে যায় পুরোনো সকল সতীকে।

পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে নারীর জীবন পুরুষের জন্যে। সতী আনোয়ারাকেও এই দীক্ষা দেয়া হয় বাল্যকাল থেকে। তার পিতামহী তাকে আত্মবিলোপকারিণী বাঁদী হয়ে ওঠার নানা শিক্ষা দেয়। বাল্যকাল থেকে আনোয়ারা শেখে :

> চিরদিন পিতৃগৃহে বাস করা কন্যার কর্তব্য নহে, শরিয়ত মতে দুনিয়ায় পতিগৃহই তাহার প্রকৃত আবাসস্থল, পরন্তু পতিসেবা না করিলে স্ত্রীলোকের নামাজ, রোজা, ধর্মকর্ম সব বিফল।

তার পিতামহী তাকে উপদেশ দেয় : 'অতএব তুমি পতিসেবামাহাত্ম্যে ধর্মকর্ম রক্ষা করিবে। পতিকুলের তৃপ্তি সাধন ও মুখোজ্জ্বল করিবে।' অর্থাৎ তার জীবন হচ্ছে চিরকালের জন্যে অন্যের। সে নিষ্কাম মিশনারীর মতো নানাভাবে 'পতিকুলের তৃপ্তি সাধন ও মুখোজ্জ্বল' করার মহান ব্রত যতো পালন করে যায়; আর তার পরকালের জন্যে বেহেশত ততো নিশ্চিত হতে থাকে। নারীকে বিভ্রান্ত করার এই শক্তিশালী কৌশলটি নব্য আদম সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আনোয়ারা কতোভাবে পতিকুলের সন্তুষ্টি বিধান করেছে; 'হুর পরীর মত সুন্দর, স্বভাব সুশীলা বিদুষী' আনোয়ারা 'সর্বগুণান্বিতা এবং গৃহস্থালীর সর্ববিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ঘর বাহিরের সমস্ত কার্যের শৃঙ্খলা পারপাট্য বিধানে ও অবিশ্রাম কর্মপ্রিয়তায় সে অল্পদিনেই প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় গৃহলক্ষ্মী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হাতের গুণে শাকভাতও অমৃতের মত বোধ হয়'। কিন্তু সে সতীলক্ষ্মী বলেই তাকে সহ্য করতে হয় অনেক দুর্ভোগ ও কটুকথা। সৎশাশুড়ি তাকে রূঢ় কথা দিয়ে পীড়ন করে, কিন্তু সে কখনোই সৎশাশুড়ির প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে না। সতী নারীর তা করতে নেই। সতী সবকিছু সহ্য করে তাই-

> ধৈর্য্যের প্রতিমা আনোয়ারা পিতৃগৃহে অবস্থানকালে যেরূপ বিমাতার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া কাল কাটাইয়াছে, পতিগৃহে আসিয়াও সেই সৎশাশুড়ির দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়া তাঁহারই মুখাপেক্ষিণী হইয়া তাঁহারই

> মনঃতুষ্টি সম্পাদনে দেহমন নিয়োজিত করিয়া স্বীয় কর্তব্য পালন করিতেছে। স্বামী শুনিলে মনে ব্যথা পাইবেন বলিয়া শাশুড়ির নিষ্ঠুর বাক্যবাণে তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল ছিদ্র হইয়া যাইত, তখন সে নির্জনে নীরবে অশ্রুপাত করিয়া শান্তিলাভ করিত।

অত্যাচার পীড়নে জীবন শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠলেও সতী নারীর ফুঁসে উঠতে নেই; তাহলে পতিকুল অসন্তুষ্ট হতে পারে; আর পতিকুলকে অসন্তুষ্ট করে যে নারী তার মতো পাপী ত্রিভুবনে নেই। নব্য আদম বেশ দয়ালু, তাই নিপীড়িত নারীকে নির্জনে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলার অনুমতি ও অধিকার সে দেয়। নতুন সতী আনোয়ারার তুল্য সহিষ্ণু ও আত্মোৎসর্গকারিণী কোনো নারীই নয়, সীতা ও রহিমাও নয়। অসন্তুষ্ট সৎশাশুড়ির সন্তোষ বিধানের জন্যে সে নিজেকে ত্যাগ করার জন্যেও স্বামীকে অনুরোধ করে :

> আমি তাহার মতিগতি যেইরূপ বুঝিতেছি, তাহাকে বোধহয় আপনি এ দাসীকে ত্যাগ করিলে, তাহার সমস্ত হিংসার আগুন পানি হইতে পারে।

আনোয়ারা শুধু পীড়ন সহ্য করে না, সে পতিদেবতার আর্থিক দুর্গতি মোচনের প্রধান সহায় হয়েও কাজ করে। পতি নূরুল এসলামের যে কোনো সঙ্কটের সময় সে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনে এবং সঙ্কট দূর করে। এতে তার মনে বিন্দুমাত্র গর্ব জাগে না, বরং সে ধন্য বোধ করে। সতী নারী কখনো গর্বিত হয় না; বরং সে যে পতিকে অর্থ দেবার সুযোগ পেয়েছে এই সৌভাগের কথা ভেবেই দিশেহারা হয়। সতী শুধু শরীরেরই শুদ্ধতা রক্ষা করে না, রক্ষা করে মনের সতীত্ব। নব্য আদম সতীকে আরো বহু কাজ করার প্ররোচনা দেয় নতুন করে। নতুন বিবিকে হতে হবে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মতো; যতো সঙ্কট আসবে পুরুষের জীবনে, সে নিজ শক্তি দিয়ে দূর করবে সকল দুর্গতি এবং তবেই সে আখ্যা পাবে সতী বলে।

বিবি রহিমা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীর অক্লান্ত সেবার জন্যে। সম্পদে সে যেমন ছিলো পতি অনুরক্ত নীরব বাঁদী, বিপদেও সে থাকে তেমনি পতি অনুরক্ত সেবাপরায়ণ অক্লান্ত বাঁদী। স্বামীর সঙ্গে সহ্য করে মহাদুর্ভোগ ও দারিদ্র্য। আনোয়ারার মর্ষকামিতাও কিংবদন্তির মতোই। তার স্বামী রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়ি এলে তার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, জীবন অর্থহীন হয়ে ওঠে। তখন স্বামী সেবাই হয়ে ওঠে তার একমাত্র কাজ, 'স্বামীর শুশ্রূষায় সে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ' করে, শুরু হয় তার 'অর্ধাসন ও অনিদ্রা'। 'পথ্য রন্ধন ঔষধ সেবন প্রভৃতি কার্য নিজ হাতে অতি সাবধানে করিতে' থাকে। শুধু সেবা করেই তার দায়িত্ব শেষ হয় না। জেলা শহরের আত্মীয়দের খবর দিয়ে আনিয়ে স্বামীর সুচিকিৎসার বন্দোবস্তও করে সে নিজেই। তার পুরো দিন আর রাতের অর্ধেক কাটে রোগীর সেবায়, বাকি সময়টুকু কাটে

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। সে প্রার্থনা করে :

> দয়াময়! দাসীর হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া যদি পতি সেবার অধিকার দিয়াছ, তবে এত সত্বর তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না। তাঁহার চরণ সেবায় দাসীর নারীজন্ম ধন্য হইতে দাও।

কোনো অবস্থাতেই সতী বিস্মৃত হয় না যে, সে চরণাশ্রিত দাসী ছাড়া কিছু নয়। এ–প্রার্থনা বাক্য তার কণ্ঠে উচ্চারিত হলেও এটি তার নিজস্ব কথা নয়, এও পুরুষতন্ত্র নির্দেশিত বাক্যাবলী; পুরুষতন্ত্র চায় নারী আহাজারি করার সময়ও যেনো পুরুষতন্ত্রের দীক্ষা বিস্মৃত না হয়, তাই সে তৈরি করে দেয় নারীর প্রার্থনার ভাষাও। আনোয়ারা শুধু স্বামীর প্রতি ভালোবাসা বোধ করে বলেই পতিসেবা করে চলে এমন নয়। আনোয়ারাকে দাঁড় করিয়া দেয়া হয়েছে নারীকুলের চিরঅনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিশেবে। লেখকের বর্ণনা এমন : 'নূরুল ইসলাম চিররোগী হইয়া পড়িলেন... আনোয়ারার ধৈর্য ও পতিব্রত যেন নারী জাতির শিক্ষার জন্যে ক্রমশ স্ফূর্তিলাভ করিতে লাগিল।' চিকিৎসাশাস্ত্র একসময় নূরুল এসলামকে সুস্থ করে তুলতে অপরগ হয়ে ওঠে। আর আনোয়ারা হয়ে ওঠে 'পতির প্রাণরক্ষায় উন্মাদিনী'। সতী রহিমার মতো সেও পতির ব্যাধি নিজ দেহে গ্রহণ করতে চায়। সতী হবার এটিও অন্যতম শর্ত। সে প্রার্থনা করে :

> করুণাময়! দাসীর শেস প্রার্থনা, তুমি তাহার দুরারোগ্য ব্যাধি দাসীর দেহে সঞ্চারিত কর, দাসী অক্লেশে অম্লান চিত্তে তাহা সহ্য করিবে। অনাথগতি! দাসীকে আর কাঁদাই না।

'উন্মাদিনী' সতী পতির প্রাণরক্ষা জন্যে এতোই মরিয়া হয়ে ওঠে যে, তার ভাগ্যে ঘনিয়ে আসে মহাদুর্যোগ। মধ্যরাতে পতির জন্যে শেকড় তুলতে গিয়ে সে অপহৃতা হয় এবং লোকজন তার সতীত্ব সম্পর্কে নানা অপবাদ রটাতে থাকে। জনরব শুনে পতিপ্রভুর চিত্তও বিমুখ হয়ে ওঠে। স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে সেও। স্ত্রীর সত্যভাষণ গ্রাহ্য করে না পতি। তার মনে জ্বলে ওঠে সন্দেহের আগুন :

> একদিকে সতী সাধ্বী, অন্যদিকে লোকাপবাদ; কোনটি ত্যাজ্য ? কোনটি উপেক্ষণীয় ? সরলা অবলা- অন্ধকার রাত্রি- সত্যই কি পাপিষ্ঠেরা তাহার সর্বনাশ করিতে পারিয়াছে ? স্মরণমাত্র তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল... তিনি শূন্য হৃদয়ে আবার ভাবিতে লাগিলেন, লোকাপবাদ অমূলক হইলেও সামান্য নহে। হায়! আমি কেমন করিয়া লোকের মুখ বন্ধ করিব? রাজদ্বারে, সমাজে, সভাস্থলে, লোকে যখন আমাকে অপহৃতা

স্ত্রীর স্বামী বলিয়া ভ্রূকুটি, উপেক্ষা করিবে, হায়! তখন আমি কোথায় লুকাইব ? হায়! খোদা আমি জীবন্তে হত হইলাম।

যে পতির জন্যে উৎসর্গ করে নিজের প্রাণ, তার প্রতি পতির বিশ্বাস শূন্য। নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্র চিরকালই পোষণ করে ঘৃণা ও অবিশ্বাস। ওই আবেগ কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে, কখনো থাকে প্রকাশিত। পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে নারীর পক্ষে সতী থাকা কঠিন, অসতী হয়ে যাওয়াই তার পক্ষে সহজ। তাই একনিষ্ঠ সতীর চরিত্র নিয়ে সংশয়ান্বিত হতে পতি নূরুল এসলামের বাধে না। আর এতো সন্দেহ এতো অপবাদ সত্ত্বেও সতী নারী স্বামীর প্রতি ঘৃণা বোধ করে না। কেননা ঘৃণা বোধ করার অধিকার তার নেই, সে প্রস্তুত হয় আরো অগ্নিপরীক্ষার জন্যে। ওই শুদ্ধিপরীক্ষা তাকে দিতে হয় পতিপ্রভুর পদতলের আশ্রয়টুকু অটুট রাখার জন্যে।

মরিয়া সাবিত্রী সতী বা বদ্ধপরিকর সতী বেহুলা

পুরুষতন্ত্র নারীকে পরগাছা হতে ফুঁসলানি দেয়, আর ওই পরগাছাকে হতে বলে তার 'বিশেষ' পছন্দই পরগাছা। যেনো তেনো পরগাছা হলে চলবে না, হতে হবে বিশেষ ধরনের পরগাছা। আবার পুরুষতন্ত্র পরগাছার মধ্যে পেতে চায় অনড় বদ্ধপরিকরতা ও অটলতা। পুরুষতন্ত্র ভঙ্গুরতা ও নির্ভরশীলতাকে নারীত্ব বলে রটনা করে মহাসমারোহে; আবার অতি আড়ম্বরতা সঙ্গে প্রচার করে যে, বদ্ধপরিকরতাও থাকা চাই নারীর স্বভাবে। একই সঙ্গে নারীর বদ্ধপরিকর হবার এলাকা ও সীমানাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দেয় পুরুষতন্ত্র। জানায় যেহেতু নারীর জীবন শুধু পতিপুরুষের জন্যে, তাই নারী বদ্ধপরিকর বা মরিয়া হবে শুধু পতির জীবন রক্ষার জন্যে। আর নারী তার নিজের জীবন কাটাবে গভীর অবগুণ্ঠনের ভেতর এবং কখনো কোনো অবস্থাতেই নারী নিজের কথা ভাবার মতো স্পর্ধা দেখাবে না। নিঃশব্দে সেবা দিয়ে যাবে সে এবং থাকবে চিরলজ্জাশীল, অসূর্যসম্পশ্যা, পর্দানশীন, মুক, খঞ্জ ও বধির। পতিপ্রভুর তুষ্টির জন্যে তার জন্ম, তাই শুধু পতিপ্রভুর জীবনরক্ষার জন্যে নারী হবে বেহায়া, নাছোড়বান্দা, লজ্জাশূন্য, কলঙ্কিনী, মরিয়া, প্রয়োজনে অবগুণ্ঠনমুক্ত। তবে নারীর নিজের জন্যে এমন হবার কোনো অধিকার নেই। যে নারী নিজের জন্যে এমন হয়ে ওঠে, তার নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে পুরুষতন্ত্রের আকাশ বাতাস। পুরুষতন্ত্র ওই নারীকে শুধু একপুরুষ ধরে ধিক্কার দিয়েই ক্রোধ মেটায় না, অনন্তকাল ধরে ওই নারীকে ধিকৃত করে রাখার সকল আয়োজনও সম্পন্ন করে রাখে। এমনটিই ঘটেছে রামায়ণের দশরথপত্নী কৈকেয়ীর ভাগ্যে। সে চিরনিন্দিত, কারণ সে নিজের বাসনার কথা বলার স্পর্ধা দেখিয়েছিলো। পুরুষতন্ত্র পতির কল্যাণের জন্যে মরিয়া নারীকে দেয় মহাসতী আখ্যা। সাবিত্রী সতীকুল শিরোমণি; কারণ নিজের কথা বিস্মৃত হয়ে সে পতির প্রাণরক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলো। একনিষ্ঠা সতী হবার অপরিহার্য উপাদান। পুরাণগুলোতে নারীর একনিষ্ঠার ফেনানো বিবরণ ছড়িয়ে আছে। ওডিসিউস খুব সহজেই বহুগামী হতে পারে, বহুকিছু করতে পারে, তার একনিষ্ঠ থাকার দরকার হয় না; কারণ সে পুরুষ। কিন্তু ওডিসিউসের স্মৃতি বুকে নিয়ে শরীর

শুদ্ধ রেখে শুধু চাদর বুনে যাওয়া ছাড়া পেনিলোপের কিছুই করার অধিকার নেই; কারণ সে নারী। নারী সঙ্কটে সম্পদে পতির প্রবাসকালীন সময়ে কিংবা বৈধব্য অবস্থায় চিরএকনিষ্ঠ থাকতে বাধ্য। পৌরাণিক সতীরা সকলেই চিরএকনিষ্ঠ। বেহুলা অকালমৃত পতির জীবন ফিরিয়ে আনার জন্যে একা গাঙুরের জলে ভেলা ভাসিয়েছিলো। তাকে পেরোতে হয়েছে দুস্তর দুর্গম পথ এবং অনেক প্রলোভন; কিন্তু সে থেকেছে সঙ্কল্পে অনড় ও চিরএকনিষ্ঠ। পুরুষতন্ত্র এই সতীদের উচ্চকণ্ঠে বাহবা দেয়, চিরপ্রণম্য সতীরূপে দাঁড় করিয়ে দেয় সাধারণ সকল নারীর সামনে এবং ওই পৌরাণিক সতীদের যশোগাথা রচনা করে চলে অঢেল উৎসাহে। তবে এই যশোগাথা নারীর যশোগাথা নয়; এটি হচ্ছে নারীকে অশেষ মর্ষকামিতার পীড়ন মুখ বুজে সহ্য করার কাজে প্ররোচিত করার একটি মহাকৌশল।

নতুন বিবি মনোয়ারা সাবিত্রী ও বেহুলা সতীর মতোই পতিপ্রেমে অতুলনীয়া বিবাহিত নরনারীর জীবনে প্রেম নামক আবেগটির অস্তিত্ব শূন্য হলেও নব্য আদম পত্নীর কাছ থেকে ওই প্রেম একতরফাভাবে ও বহু পরিমাণে পেতে চায়। তবে এই প্রেম দু'জন সমান মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের আবেগগত সম্পর্ক নয়। 'পতিপ্রেম' বলতে নব্য আদম বোঝে প্রভুর প্রতি বাঁদীর সকৃতজ্ঞ ভক্তি, সেবা ও ভীতিকে। মনোয়ারার স্রষ্টা নব্য আদম বিশ্বাস করেন :

> নারী জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে স্বামীসেবা। ঐ স্বামীসেবার মধ্যেই নারীর ইহকাল ও পরকাল। তাহার সুখ শান্তি, বাসনা-কামনা- ঐ এক পতিসেবার মধ্যে নিবদ্ধ। নারীর পতিই ধর্ম, পতিই কর্ম-পতিই তাহার সর্বস্ব। পতিরত্ন হইতে যে নারী বঞ্চিতা, সে নারী অতিশয় দুর্ভাগ্যবতী। সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য সাধন ও পরিপূর্ণভাবে ধর্মবিধি প্রতিপালন করিতে হইলে বিবাহ করা নারী জাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য।

গ্রন্থকার পতিসেবা ছাড়া নারীর আর কোনো কাজ আছে বলে বিশ্বাস করেন না। গ্রন্থটিতে পতিসেবার নানা ফজিলত বর্ণনা করেন তিনি। একই সঙ্গে পতিসেবার করার পন্থাগুলো নির্দেশ করেন। এ- গ্রন্থটিকে তাই নারীর পতিসেবা বিষয়ক 'মকছেদুল মোমেনীন'ও বলা যেতে পারে। এ-লেখক সতীত্ব বলে গণ্য করেন পতিসেবাকে এবং সতী মনোয়ারার পতিভক্তি ও স্বামীসেবার বিশদ ও অতিশায়িত বিবরণ তিনি দিয়ে চলেন অক্লান্তভাবে। মনোয়ারা সাবিত্রী ও বেহুলার মতোই পতির জীবনরক্ষার জন্যে মরিয়া ও বদ্ধপরিকর। নতুন বিবিদের সকলেই এমন মরিয়া সতী। তবে এই নতুন বিবিদের এবং মনোয়ারাকেও পৌরাণিক সতীদের চেয়েও দুরূহ নানা কাজ করতে হয়। পৌরাণিক সতীরা মৃতপতির প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। নতুন বিবিদের শুধু মৃত্যুর কবল

থেকেই পতিপ্রভুদের জীবনরক্ষা করতে হয় না, বাস্তব আরো বহু দুর্বিপাক থেকেও রক্ষা করতে হয় পতির জীবন। নতুন আদমের জীবনে কখনো আসে দুরারোগ্য ব্যাধি; অধিকাংশ সময়ে আসে কঠিন কোনো বাস্তব সঙ্কট, যা তাদের জীবনকে বিপন্ন করে; নতুন বিবিদের সকলেই তখন হয়ে ওঠে সাবিত্রী ও বেহুলার মতো অকুতোভয় ও মরিয়া; অতি পর্দানশীন পরহেজগার অসূর্যম্পশ্যা হয়েও নতুন বিবি তখন পরপুরুষ উকিল ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দেয়; কেউ কেউ পতির জীবনরক্ষার জন্যে নানা গোপন সত্য তথ্য ও আসল সাক্ষী এমন সুকৌশলে জোগাড় করে যে, অতি দক্ষ পুরুষ গোয়েন্দাও তাদের কাছে হার মানে। নতুন বিবি এমন বিচিত্ররূপিনী হতে পারে শুধু পতির জন্যে।

পতির জন্যে বিবির বিচিত্ররূপিনী বহুরূপী হওয়াই বিধেয় বলে ফতোয়া দেয় পুরুষতন্ত্র। সাবিত্রী ও বেহুলাকে লড়াই করতে হয় শুধু বিরূপ ও খামখেয়ালী দেবতার বিরুদ্ধে; আর নতুন সতীদের লড়তে হয় বাস্তব বহু ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতার সঙ্গে। তাদের অবস্থা তাই আরো সঙ্গীন। এ- কারণেই এই নতুন বিবিরা নব্য আদমের রচনা অনুসারে আরো বেশি মহিয়সী। মনোয়ারা ও অন্য সকল নতুন বিবি ভালোভাবেই জানে যে–

> নারী জীবনে পতিই সর্বস্ব। পতিসেবা ব্যতীত নারীর জীবনধারণ বৃথা।... নারীর মহত্ত্ব-মহিমা, গৌরব-গরিমা যাহা কিছু বিকাশ পাইয়াছে, তা সমুদয়ই কেবল এক স্বামীসেবার ফলে।

যে কোনো নারী 'গুণ গরিমা সুযশ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহার কর্তব্যমূলে ঐ পতিভক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়'। কিভাবে ওই পতিসেবা করবে নারী? সব সময় নিঃশব্দে পালন করবে পতির সকল আদেশ নির্দেশ, পতির সংসারের সকল কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করবে। পতির প্রতি কখনো রুষ্ট হবে না, অশ্রদ্ধা পোষণ করবে না, পতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবে না, বরং সকল বিষয়ে পতির প্রতি থাকবে অগাধ আস্থা। কারণ পতিপ্রভু চিরশ্রেষ্ঠ এবং নির্ভুল। নারী কোনো অবস্থাতেই তার সমকক্ষ নয়। পতিপুরুষের পদতলে যেহেতু বেহেশত, তাই ওই পদসেবাই সতী নারীর একমাত্র কাজ। অজ্ঞ বুদ্ধিহীনা নারী নিজের অযোগ্যতার কথা মনে রেখে সবিনয়ে পতির কাছ থেকে সব সময় শিখে নেবে সবকিছু। সুস্থ পতির পরিচর্যা সে করবে নিজ হাতে, এগিয়ে দেবে প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং নিজে সর্বক্ষণ থাকবে তটস্থ। আর পতির পীড়ার সময় সে নিজের আহার বিহার নিদ্রার কথা বিস্মৃত হবে, পীড়িত স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করবে নিজহাতে। তবেই নারীর পক্ষে 'নশ্বর জগততলে অবিনশ্বর যশমান ও ভক্তি শ্রদ্ধার অধিকারিনী' হওয়া সম্ভব।

সতী মনোয়ারার সতীত্ব নিয়ে পতির মনে সন্দেহ নেই. কেননা এ- গ্রন্থে সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা ও সতীর সতীত্বের জয়ের বর্ণনা দেয়া লেখকের উদ্দেশ্য নয়। এ- গ্রন্থের সতী মনোয়ারা পতির জীবনরক্ষার জন্যে পালন করে মহাতপস্বিনীর ভূমিকা। মনোয়ারার স্বামী শামসুল আলমের জীবন বিপন্ন হয় কুচক্রীদের চক্রান্তের কারণে। সে খুনের মামলায় জড়িয়ে যায়। তার জন্যে তখন অবধারিত হয়ে ওঠে প্রাণদণ্ড অথবা দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড ভোগের শাস্তি। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সুখের সংসারে নেমে আসা এ- বিপদে পতি কাতর হয়; কিন্তু সতী নারী তখন ভেঙে পড়ে না, বরং সাহসে বুক বাঁধে। বিপদমুক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় মনোয়ারা বড়োই ভঙ্গুর, ভীরু, অবগুণ্ঠিতা, অন্তঃপুরবাসিনী কোমলা সাধ্বী পত্নী; কিন্তু পতির বিপদের সময় সে মুহূর্তে হয়ে ওঠে পরাক্রান্ত দুর্গতিনাশিনী এবং অভয়দাত্রী। পতির বিপদে এই সতীপত্নী দু'ভাবে পতিসেবা করে। পতিপ্রভুকে মনোয়ারা অভয় দেয়। মনোবল শক্ত রাখার জন্যে জোগায় শক্তি সাহস। প্রকাশ্যে উচ্চারণ করে নানা উদ্দীপনামূলক সান্ত্বনাবাক্য আর গোপনে পতিরও অলক্ষ্যে খোঁজে বিপদ থেকে মুক্ত হবার বাস্তব উপায়। সে পতিকে সান্ত্বনা দেয় এভাবে :

> প্রাণেশ্বর! এ বিপদ, এ জঘন্য অপবাদ আপনার একার নয়, আমি আপনার সহধর্মিনী অর্ধাঙ্গিনী, এ আসন্ন বিপদের আমি সমভাগিনী। ইহাতে যদি যথাসর্ব্বস্ব হারা হইতে হয়, প্রাসাদবাসিনী সওদাগর দুহিতাকে অরণ্যবাসী হইতে হয়, তাহাতেও কৃতসঙ্কল্প। আপনি নিশ্চিন্ত হউন। স্বামীন, খোদাওন্দাতায়ালা কখনও আপনার উপর বিরূপ হইবেন না। আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতেছি, যদি আমি একমনে একপ্রাণে আপনাকে ভালবাসিয়া থাকি- যদি আপনারই ভালোবাসা আমার হৃদয়ে একাধিপত্য লাভ করিয়া থাকে, রমণীর সতীত্ব ধর্ম বলিয়া যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে একথা নিশ্চয় জানিবেন- কোনদিনই আপনাকে কেহ কোন বিপদে ফেলিতে পারে না।

জনরব শুনে অনুগতা পত্নীর সতীত্ব নিয়ে সন্দিহান হতে পতিপ্রভু কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না; কিন্তু পতিপ্রভু খুনের মামলার আসামি হলেও সতী সাধ্বী পত্নীর মনে কিছুমাত্র সংশয় দেখা দেয় না। কেননা, প্রভুর নিষ্কলঙ্কতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোনো অধিকার নারীর নেই। পত্নীর নামে কলঙ্ক রটলে পতি তাকে ত্যাগ করে ঝামেলামুক্ত হয়, কিন্তু নারীকে দীক্ষা দেয়া হয় পতির কলঙ্ককে নিজের কলঙ্ক বলে গণ্য করতে। তাই মনোয়ারা ধনশালীর কন্যা হয়েও খুনের মামলার আসামি পতির প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণা বোধ করে না; বরং গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, তার পতি ফেরেশতার চেয়েও সৎ। সতীনারী মাত্রই পতি সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পোষণ করে বলে লেখক রটনা করেন, কেননা পুরুষ স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ ও নিষ্কলুষ। কিন্তু

নারী সম্পর্কে এ- লেখকেরা এবং তাঁদের নায়কেরা পোষণ করে গভীর অবিশ্বাস। তাই পত্নীর নিষ্ঠা আনুগত্য বিশ্বস্ততার প্রভূত প্রমাণ পেয়েও পত্নীর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে দ্বিধা হয় না তাঁদের। যেকোনো রটনা শোনামাত্র পতির মন সন্দেহের বিষে ছেয়ে যায়। কিন্তু নারীর কোনো অধিকার নেই সন্দেহ পোষণ করার। শুধু নিজের যথাসর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে পতিকে রক্ষাই তার কাজ। তবে পতির চরম সঙ্কটের সময়েও সতীনারী কোনোমতেই নিজের প্রকৃত অবস্থার কথা বিস্মৃত হয় না। সে যে পদসেবিকা এ- কথা কোনো অবস্থাতেই সে ভোলে না এবং সর্ব অবস্থাতেই পতিপ্রভুর সঙ্গে কথা বলে 'তমিজে'র সঙ্গে। কেননা, এটিই ঐশী বিধান। সতীনারী কখনো ঐশী বিধান লঙ্ঘন করে না।

সতী মনোয়ারাও সর্বঅবস্থায় ওই ঐশী বিধান মেনে চলে। সে যে পতির পদতল আশ্রিতা দাসী এ- কথা সবসময় মনে রাখে এবং সবসময় সে থাকে সমান বিনীত ও প্রভুর কৃপাপ্রার্থী। সতীনারী শুধু পতির সেবাযত্নই করে না, সে পতির মনের সুখদুঃখের খবরও রাখে। তার মনোবেদনা কখনো তাই পতিপ্রাণা পত্নী মনোয়ারার অলক্ষ্য থাকে না। চিন্তিত পতির উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সমান অংশীদার হবার জন্যে সে এমন ভাষায় আবেদন করে :

> নাথ, দাসীকে সামান্য পদসেবিকা বিবেচনায় ঘৃণা করিবেন না। দাসী যদিও সামান্য রমণী, তথাপি সে আপনার সুখদুঃখের সমঅংশীভগিনী। স্বামীর প্রাণেব ব্যথা অন্তরের দুঃখ-স্ত্রী যদি না শুনিতে পায়, তবে নাথ, সে স্ত্রীর জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।

সতী মনোয়ারা সঙ্কটে সম্পদে সমান অনুগত ও পতিভক্ত। এ সতী পতিকে রক্ষা করার তপস্যা করে গোপনে, একা সে হেঁটে চলে বাস্তবতার দুর্গম পথ ধরে এবং সফল হয়। কিন্তু ওই সাধনার কথা সে সকলের কাছে গোপন রাখে। কেননা, সতীনারী কখনো যশ-সুখ্যাতি-প্রশংসার লোভ করে না। পতিসেবাই তার জীবনের লক্ষ্য। পতিকে প্রাণভরে সেবা করার বাসনা ছাড়া তার আর কোনো কামনা-বাসনা থাকতে পারে না। অন্য কোনো স্বপ্ন-বাসনা-সাধ থাকলে সে সতীনারীই নয়। সতী শুধু নিজেকে উৎসর্গ করে। মনোয়ারা নিজের চেষ্টায় বিপন্ন পতিকে রক্ষা করে। তার স্বামী বেকসুর খালাস পায়। পতিকে বিপদমুক্ত করাই সতীর নারীজন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওই মহান ব্রত পালন করেই মনোয়ারা ধন্য হয়। আর কিছু তার কাম্য নয়। বদ্ধপরিকর সতীকে অবশ্যই হতে হয় আত্মলোপকারিণী ও মূক, তবেই সে হতে পারে প্রকৃত সতী। মনোয়ারা এ কাজে খুবই দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হন। সতী মনোয়ারা নিজে মূক হলেও লেখক সতীর 'বুদ্ধিকৌশল ও পতিভক্তির পরকাষ্ঠা'র স্তবে উচ্চকণ্ঠ :

> ধন্য মনোয়ারা! ধন্য তোমার পতি প্রেম!! তুমি নারীকুলের কোহিনূর মণি! এ অকৃতজ্ঞ জগতে তোমার উপমা নাই। তোমা হেন নারীরত্ন যদি সকল গৃহে বিরাজ করিত- আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাহা হইলে এই জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার এক অনির্বচনীয় শান্তিসুধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তাই বলিতেছি- হে রমণীগণ! তোমরা সাধ্বী সতী মনোয়ারার অনুকরণ করিও। মনোয়ারার ন্যায় পতিভক্তিতে প্রাণ ঢালিয়া দাও, দেখিবে তখন তোমাদের অশান্তিময় সংসার মধুময় হইয়া উঠিবে- কত সুখশান্তি ফুটিয়া উঠিবে- তাহা তোমরা ধারণা করিতে পারিবে না।

এ-উদ্ধৃতিটিকে শুধু সতী মনোয়ারার স্তব নয়, নব্য আদমের গভীর নারী বিদ্বেষের পরিচয়ও মুদ্রিত হয়ে আছে। নারীকে এখানে দায়ী করা হয়েছে সংসারের সকল অশান্তির জন্যে। অন্য নারী পতিভক্তিতে প্রাণ ঢেলে দেয় না বলেই সংসারে এতো অশান্তি। মনোয়ারা নিজেকে নিংড়ে দিয়েছে বলেই তার সংসার এতো মধুময়। নারীকে দেয়া এই হিতোপদেশ নারীর হিতের জন্যে নয়। মনোরম হিতকর পরামর্শের ছলে এখানে ছড়ানো হয়েছে নারীকে গভীরভাবে অন্ধ ও মূঢ় হবার প্ররোচনা।

'আলেমা, মোহাদ্দেসা, ফাকিহা' বিবি সালেহা : অভিনব নতুন সতী

সালেহা অন্য সতীদের চেয়ে ভিন্ন, সে অভিনব এক নতুন সতী। এ- সতী গৃহপরিচারিকা হবার সুযোগ পায় না, কেননা নব্য আদম তাকে চায় বিদ্যাবতী বাঁদী রূপে। সে বাস কবে গৃহের প্রান্তে। সুদৃশ্য খাঁচার দাঁড়ে বসে শেখানো বুলি আউড়ে পতিপ্রভুকে বিনোদিত করাই তার জীবন। তাই 'শাস্ত্রালোচনা ও অধ্যয়নেই সালেহা অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া' থাকে। 'বিবি সালেহা' কেবল রূপ ও সতীত্বসর্বস্ব নয়। সেও সতী, তবে শুধু সতীত্বের জোরেই সে প্রসিদ্ধ নয়। পুরুষতন্ত্র নতুনরূপে দেখতে চেয়েছে এই নতুন সতীকে। সতী সালেহাকে পালন করতে হয় পতিপ্রভুর মনোরঞ্জনকারিণীব ভূমিকা। স্বামীর জীবনের সঙ্কট মোচন এই সতীর জীবনের একমাত্র ব্রত কিংবা পতিভক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপনও তার ব্রত নয়। সতী সালেহাকে করতে হয় বিদ্যা অর্জনের মহাতপস্যা। এই নতুন বিবি 'বিদ্যার মাহাত্ম্য ও শিক্ষার গুণে' 'সকলের হৃদয়াকর্ষণ' করে। সে ঘরে বসে পড়াশোনা করে 'উলা' পাশ করে। তবে অন্য নারীদের মতো তার জ্ঞানার্জন এ পর্যন্তই থেমে থাকে না। নব্য আদম তাকে দেখতে চায় 'উচ্চশিক্ষিতা' রূপে। তাই তার নিয়তি হয়ে ওঠে লেখাপড়া করা। তার বাসনা এমন : 'অধিকতর উচ্চজ্ঞান লাভেব জন্যে আমি অভিলাষিণী'। এটি তার নিজস্ব বাসনা বা অভিলাষ নয়, সে পুরুষতন্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই এমন অভিলাষ উচ্চারণ করে। জ্ঞানলাভের জন্যে সে গৃহত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় না, এক আশ্রয় থেকে অন্য অঞ্চলে যেতেও 'কোনই আপত্তি' থাকে না তার। তার উচ্চশিক্ষা লাভের আগ্রহ এতো প্রবল যে, সে উচ্চশিক্ষিত হবার আগে বিবাহিত হতেও সম্মত হয় না। সে প্রাণপণ করে উচ্চশিক্ষিত হবার তপস্যা শুরু করে এবং সে হয়ে ওঠে 'শিক্ষিতা' আলেয়া হয়ে ওঠে হাদিসশাস্ত্রজ্ঞ (মোহাদ্দেসা), হয়ে ওঠে কোশাস্তফা (ফাকিহা)

এ-এভাবে এই সতী নিজেকে পতিপ্রভুর জন্যে প্রস্তুত কবে এবং অবশেষে আত্মসমর্পণ কবে পতিব পদতলে। পতি সেবাই তার জীবনের ব্রত। তবে এই সতী

পতিসেবা করে একটু ভিন্নভাবে। সে পতির চিত্তের সুখের জন্যে পালন করে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভূমিকা। অন্য সতীরা উদয়াস্ত কায়িক শ্রম দিয়ে সতীত্ব জাহির করে; এই সতীকে করতে হয় প্রতিপ্রভুর জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার কাজ। জ্ঞানবাদ প্রভুর অভিলাষ পূরণ ও নির্দেশ পালনই তার জীবন। যখন শাস্ত্র ব্যাখ্যার নির্দেশ দেয় পতি, সতী সালেহা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে চলে। যখন পতিপ্রভু তর্ক করার বাসনা জ্ঞাপন করে, তার কাজ হয়ে ওঠে অবিশ্রাম তর্ক করে চলা। পতি 'শিক্ষিত ও শাস্ত্রভিজ্ঞ' হলেও ইচ্ছে করেই পত্নীর কাছে পরাভূত হয়। এটি নব্য আদমের নতুন খেয়াল। শুধু সতী গৃহপরিচারিকা তাকে আর পরিতৃপ্ত করে না, তাই তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এমন আলেমা সতী বিবির। তার কাছে তর্কে পরাভূত হয়ে সে সুখী হয়। কারণ এই পুতুল তার নিজেরই সৃষ্টি এবং পুতুল নাচটিও সম্পন্ন করছে সে নিজে। তার শেখানো বুলি দিয়ে পোষা পাখিটি তাকে দমিয়ে দিতে পারছে দেখেই সে রোমাঞ্চিত হয়। নব্য আদম রোমাঞ্চিত হয় নিজেরই কৃতিত্বে; নারী গৌণ উপলক্ষ মাত্র। পত্নী সালেহার সঙ্গে পতিপ্রভু রাত্রির শয্যায় নানা প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক জুড়ে দেয় :

> সময়ে সময়ে জামালের সহিত সালেহার সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক সময় অনেক কূটতর্কের অবতারণা করে। কিন্তু স্ত্রীকে পরাজিত করা তো দূরের কথা নিজেই পরাস্ত হয়। ইহাতে সে ক্রুদ্ধ না হইয়া মনে মনে আনন্দোপভোগ করে।

সালেহাকে সে নানাভাবে উসকে দেয় আর 'সালেহার মুখনিঃসৃত সাধকের উপদেশাবলীর ভাবাম্বুরাশির মধ্যে সন্তরণ করিতে করিতে জামাল এমনই বিস্ময়বিহ্বল ও ভাবোচ্ছ্বসিত' হয়ে পড়ে 'যে তন্মায়াবস্থায় সে স্পন্দনহীন জড়ের মত' হয়ে যায়। তারপরেই তার চিত্ত উল্লসিত হয়ে ওঠে। এমন স্ত্রীরত্ন লাভ করার গর্বে সে গর্বিত হয়ে ওঠে। সে বোধ করে 'খোদা আমাকে তোমার মতো স্ত্রী দান করে সত্য সত্যই ধন্য করেছেন।' পতিপ্রভু পত্নীর জন্যে তৈরি করে গ্রন্থাগার; 'বহুস্থান হইতে সংগৃহীত কেতাবের দ্বারা গৃহমধ্যে সালেহার জন্যে কেতাবখানা স্থাপিত' হয়। 'সালেহার মুখে শাস্ত্রের বাণী ও কোরান-হাদিসের আদেশ-নিষেধ শুনিবার ও স্ত্রীধর্মসংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য জটিল বিষয়ের সমাধান করিবার জন্যে' 'বহু ললনা' সালেহার পাশে ভিড় জমায়। লেখক জানান, শুধু সতীত্ব কিংবা রূপ দিয়ে স্বামীকে মুগ্ধ করা খুব সামান্য কাজ। নারীকে সতী হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই হতে হবে অতি বিদ্যাবতী। তবেই পতিপ্রভুকে তুষ্ট করা সম্ভব। তিনি বলেন :

> সালেহা আজ বিদ্যার মাহাত্ম্যে স্বামীকে কিরূপে সন্তুষ্ট ও সুখী করিতেছে। স্বামীর গৃহকে সে কিরূপ তীর্থস্থানের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে।

> শিক্ষার গুণে সে আজ কি শ্রেষ্ঠত্বই না লাভ করিতেছে। কাহার না সম্মান ও আদরেব পাত্রী হইতেছে ? সালেহা কেবল রূপ লইয়া এ বাটীব বধূ হইলে কে তাঁহাকে সম্মান করিত ? কে তাহার সংস্পর্শে ও সংশ্রবে আসিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত?

তাই উপন্যাসের শেষে নারীকে তিনি বিদ্যাবতী হবার জন্যে নানাভাবে প্ররোচিত করেন। বিদুষী নারীকে তিনি তুলনা করেন 'গোলাপ পুষ্পের সঙ্গে'। তাঁর কাছে 'কেবল দৈহিক সৌন্দর্যমণ্ডিতা রমণী সুবাসবর্জিত পলাশ পুষ্পের তুল্য। পলাশ পুষ্প সৌন্দর্যে নয়নরঞ্জন করিলেও গোলাপ পুষ্পের ন্যায় কেহই উহাকে বুকে তুলিয়া লয় না, নাকে ধরে না বা কবরীতে রাখে না'। নারীর মুক্তির জন্যে উৎকণ্ঠিত কোনো মিত্রের পরামর্শ নয় এটি; আরো বেশি পুরুষতন্ত্রের ছাঁচ মতো তৈরি হবার জন্যেই পুরুষতন্ত্রের এ- অনুচর এমন প্রচারণা চালিয়েছেন এখানে। শুধু গদ্যে বক্তব্য জ্ঞাপন করে তুষ্ট হন নি তিনি, অবশেষে নিয়েছেন পদ্যের আশ্রয়। ওই পদ্য এমন :

> প্রিয় ভগ্নি, যদি মোর কথা মনে লয়
> মুহূর্তের আয়ু বৃথা নাহি কর ক্ষয়
> সাগ্রহে করহ শিক্ষা বিদ্যা শিষ্টাচার
> ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার।

বিদ্যাবতী ধর্মশীলা সুশীলা ভার্যা বা মূক গৃহপরিচারিকা

নব্য আদম বন্দনা করে পরম সতীর। তবে সংসারে সে পেতে চায় মূক এক সুশীলা ভার্যা। সেও সতী, তবে সতীত্বের তেজ প্রদর্শনই তার প্রধান কাজ নয়। গৃহস্থালির কাজ অতি উত্তমরূপে সম্পন্নকারিণী পরিচারিকা সে। গরীবের মেয়ে উপন্যাসটিতে ওই সুশীলা ভার্যার ভূমিকা পালন করে নূরী। নব্য আদম সুশীলা ভার্যাকেই 'আদর্শ রমণী' রূপে গণ্য করে এবং গদ্যে-পদ্যে ওই আদর্শ রমণীয় মহিমা কীর্তন করে চলে। এ- আদর্শ রমণী নিঃশব্দ, চিরবাধ্য গৃহপরিচারিকা। মোহাম্মদ নজিবর রহমানের স্বরচিত পদ্যে 'আদর্শ রমণী'র এমন বন্দনা পাওয়া যায় :

বিলাসিনী যে রমণী গৃহস্থালী কাজ
সম্পাদন আপন ভাবিয়া না করে,
হউক তাহার পতি রাজ-অধিরাজ
অধমা সে নারী সংসার ভিতরে।
আত্মহারা না হইয়া সৌভাগ্য সোহাগে,
পরন্তু যে করে স্বকরে, যতনে;
পরিজন প্রীতি হেতু প্রেম অনুরাগে
আদর্শ রমণী সেই যথার্থ ভুবনে।

নব্য আদম রটনা করে ওই নারীই উত্তমা যে গৃহস্থালির সকল কাজ নিজের হাতে সম্পন্ন করে। তাকে নানা গালভরা নামে ডাকে এবং বঙ্গদেশের সকল গৃহস্থকন্যাকে এমন 'আদর্শ নারী', হয়ে ওঠার জন্যে প্ররোচনা দিয়ে চলে। নতুন আদম প্রচার করে সুশীলা ভার্যা হতে পারে সেই নারী, যে পতি অনুগতা। পতির নির্দেশমতো পতির সংসারের জন্যে উদয়াস্ত খেটে সে সংসারকে সুখের সংসার করে তোলে। কিছুই সে নিজের পছন্দমতো কিংবা ইচ্ছেমতো করে না, করার অধিকার তার নেই। সে পালন করে পতির নির্দেশ। এই নিঃশব্দ নির্দেশ পালনও

পরম পতিব্রত বলে অভিহিত করে পুরুষতন্ত্র। এ-বিবিও সতী আর প্রবল ধর্মশীলা। সংসারকে নন্দনকাননে পরিণত করার জন্যে নারীকে অবশ্যই সতী ও পরহেজগার হতে হবে। সুশীলা ভার্যাকে বিদ্যাবতীও হতে হয়। কারণ সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়। পালন করতে হয় সংসারের আয়ব্যয়ের হিশেবপত্র রাখার কাজ আর প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখে মনোরঞ্জনের দায়িত্ব। নতুন বিবি নূরী একাই পালন করে সংসারের সকল দায়িত্ব। পূরণ করে পতির সকল চাহিদা। তাই তার প্রশংসায় সকলেই উচ্চকণ্ঠ। প্রশংসা অবশ্য তাকে করা হয় না, করা হয় তার আত্মবিলোপ করার প্রতিভাকে, ক্লেশ সহ্য করার শক্তিকে। অন্য নতুন বিবিদের সঙ্গে তার ভিন্নতা রয়েছে। অন্য নতুন বিবিরা নতুন আদমের স্বপ্নসুন্দরী; দ্বিতলবাসিনী বেহেশতী হুরী। পতিভক্তি প্রদর্শন ও সতীত্বের তেজ দেখানোই তাদের জীবন। তারা সংসারে বাস করে, অতুলনীয় পতিভক্তি প্রদর্শন করে, পতির দুর্গতি দূর করে, কিন্তু এ- ছাড়া তারা আর কিছু করে না। নতুন বিবি নূরী এদের চেয়ে ভিন্ন। নতুন আদম তার আটপৌরে সংসারে সতী বিদ্যাবতী ধর্মশীলা সুশীলা পত্নীকেই বেশি করে চায়। নতুন বিবি নূরী মূক গৃহপরিচারিকা ছাড়া কিছু নয়। সেও অন্যদের মতোই পতিভক্তি প্রদর্শন করে, তবে পরাক্রান্ত দুর্গতিনাশিনী সে নয়। বিশৃঙ্খল সংসারে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, পতির আদেশ মতো কাজ করার জন্যেই ওই সুশীলা ভার্যার জীবন। আনোয়ারা, সালেহা, মনোয়ারা অতি সুন্দরী। তাদের জীবনকথা পাঠ করে রোমান্স পাঠের সুখ পাওয়া যায়। আর নূরী সাধারণ সতী, প্রায় অসুন্দর। তবে ওই সাধারণ সতীর ভাবমূর্তিই ওই সময়ের বাঙালি মুসলমান সমাজে ব্যাপক প্রভাব রাখে। ঘরে ঘরে ওই ছাঁচে প্রস্তুত হতে থাকে বহু নারী, পতির সংসারকে সুখে ভরিয়ে তোলার জন্যেই যাদের জীবন। নূরী যেমন পতির সবধরনের চাহিদা মেটাবার কাজে নিজেকে সঁপে দেয়; নূরীর ছাঁচে গড়ে ওঠা বাস্তব নারীরাও অমনভাবেই নিজেদের বলি দেবার জন্যে প্রস্তুত করে।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালি হিন্দু সমাজে এমন ভূমিকা পালন করে সুশীলার উপাখ্যান গ্রন্থটি। সুশীলার উপাখ্যানও বিদ্যাবতী ধর্মশীলা সুশীলা ভার্যার আখ্যান। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের লেখা এ-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। এ-গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখক স্পষ্ট করে নির্দেশ করেন তাঁর উদ্দেশ্যে। এ-গ্রন্থের প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে লেখক জানান : 'বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাদের কিরূপ গুণযুক্ত হওয়া উচিত সুশীলার বাল্যচরিত্র লিখিয়া আমি তাহা প্রথমভাগে প্রকাশ করিয়াছি।' দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন থেকেও লেখকের অভিপ্রায় জানা যায়; 'বঙ্গদেশীয় রমণীগণ যাহাতে যথানিয়মে প্রতিপালন করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যে লোকযাত্রা

নির্বাহ করিতে শিক্ষা পায়'-তাই তিনি এ- গ্রন্থে রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সুশীলার উপাখ্যান-এ তন্ন তন্ন করে গৃহধর্ম পালনের নারীর ভূমিকা ও গৃহে নারীর স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। একটি সুশীলার আখ্যান বলার মধ্য দিয়ে লেখক চালিয়েছেন বহু সুশীলা তৈরির প্রচারণা। লেখকের অভিলাষ এমন : 'পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, যেন অল্প বয়স্কা বালিকারা ইহা পাঠ করিয়া ঐ বালিকার ন্যায় পরিশ্রমী, ধর্মপরায়ণা এবং সচ্চিরিত্রা হইতে যত্নবতী হয়।' গরীবের মেয়ে উপন্যাসটিতে এমন স্পষ্টভাবে লেখক তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিলাষ জ্ঞাপন করেন নি। সুশীলার উপাখ্যান সমাজ সংস্কারমূলক গ্রন্থ। সুশীলার ছাঁচে। বালিকারা গড়ে উঠলে পুরুষের সমাজ ও সংসার কেমন শান্তি ও সুখে ভরে উঠবে তা দেখানোই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু সৃষ্টিশীল হিশেবে গৌণ হলেও মোহাম্মদ নজিবর রহমান রচনা করতে চেয়েছেন উপন্যাস, সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থ নয়। তাই মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনি সরাসরি প্রচারণার কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন নি। তাঁকে কাহিনী ফাঁদতে হয়েছে; কিছু জলো আবেগের মিশেল দিতে হয়েছে এবং তৈরি করতে হয়েছে 'সুগার কোটেড ট্যাবলেটের' মতো গরীবের মেয়ে উপাখ্যানটি। যাতে পুরুষতন্ত্র নির্দেশিত একটি বিশেষ ছাঁচে নারীদের তৈরি হবার ফুসলানি আছে; তবে ওই ফুসলানি সুশীলার উপাখ্যানের মতো সরাসরি দেয়া হয় নি এখানে। সুশীলার উপাখ্যান জানায় নারী জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, জানায় উত্তম গৃহিণী হওয়ার নিয়মকানুন, শিক্ষা দেয় পতির সন্তোষ বা তুষ্টি অর্জনের বিধিবিধানগুলো। তবে সুশীলাকে তৈরি করার দায়িত্ব পালন করে সমাজ ও পরিবার। এবং সুশীলার পতিদেবতার পায় তার চাহিদামতো প্রস্তুত এক সুশীলা ভার্যা। নতুন আদম এমন প্রস্তুত পুতুল লাভের সুযোগ পায় না। তার পুতুল তৈরি করতে হয় তাকে নিজেই। সে তাই খুঁজে নেয় পুতুল বানাবার উপযোগী কাদামাটি এবং পুতুল গড়ে নিজের পছন্দমতো ও সুবিধামতো ছাঁচে। বিবাহপূর্ব নূরী প্রস্তুত পুতুল নয়। সে তখন পুতুল হবার জন্যে অপেক্ষমান উপকরণমাত্র।

পরিচারিকা : 'আদর্শ রমণী'

নতুন আদম যে 'আদর্শ রমণী'র স্বপ্ন দেখে, ওই 'আদর্শ রমণী' চিরবাধ্য চিরবশমানা পরিচারিকা ছাড়া কিছু নয়। ওই 'আদর্শ রমণী' সে গড়তে চায় নিজের হাতে, নিজের মনমতো করে। সে বিশ্বাস করে ওই আদর্শ রমণী তৈরি হতে পারে শুধু তার নিজের হাতে। সে নিজে তৈরি না করলে ওই বিবি কখনোই প্রকৃত আদর্শ রমণী হয়ে উঠবে না। তাই নতুন আদম নূর মোহাম্মদ তার বিবিকে এমন নির্দেশ দেয় :

> আমার আদেশ পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালন করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিলে তোমাকে আদর্শ রমণী রূপে গঠিত করিব আশা করিয়াছি।

নতুন বিবি নূরীকে দিয়ে উচ্চারণ করানো হয় পুরুষতন্ত্রের তৈরি করে দেয়া উত্তর : 'আমি কায়মনোবাক্যে আপনার উপদেশ মানিয়া চলিব।' নতুন আদম বিশ্বাস করে নারী এমন অপদার্থ যে সে নিজের যোগ্যতায় পরিচারিকাও হয়ে উঠতে পারে না। পুরুষের দেয়া বিধিবিধান প্রতি পদক্ষেপে মেনে চলেই শুধুমাত্র সে তার অযোগ্যতা দূর করতে পারে। অন্যরা মেনে চলে না বলেই অযোগ্য ও নিকৃষ্ট। আর নূরী আদেশ পূর্ণমাত্রায় পালন করে বলেই হয়ে ওঠে উৎকৃষ্ট, পতিপ্রভুব 'দেল আরাম'। যেহেতু নতুন আদম সাক্ষরা নারীকেই উত্তম পরিচারিকা হবার যোগ্যতাসম্পন্ন বলে মনে করে; তাই নারী শিক্ষার ঘোর সমর্থক সে। তাই নতুন বিবির বিদ্যাবতী হয়ে ওঠে একান্তই নতুন আদমের প্রয়োজনে। ওই বিদ্যার্জন নতুন বিবির মুক্তি বা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার জন্যে নয়। তাকে কিছু পরিমাণে বিদ্যাবতী করে তোলা হয় পুরুষতন্ত্রের প্রয়োজনে। উৎকৃষ্ট পরিচারিকা হবার জন্যে সামান্য বিদ্যা অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে বলেই পুরুষতন্ত্র নারীর শিক্ষার জন্যে সামান্য বিদ্যা অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে বলেই পুরুষতন্ত্র নারীর শিক্ষার জন্যে এতো সোচ্চার হয়ে ওঠে। নারীশিক্ষা বলতে সে বোঝে নারীর সামান্য লিখতে পড়তে জানাকে। তাই পাঠশালার 'ছাত্রবৃত্তি' পাশ বিবি তার কাছে বিদূষীর বলে গণ্য হয়। তবে যে- বিদ্যা নারীকে শুধু বিদ্বান ছাড়া আর কিছু করে না, নতুন আদম ওই

বিদ্যার ঘোর বিরোধী। কারণ নারীকে সে বিদ্বান দেখতে চায় না, দেখতে চায় পরিচারিকা হবাব জন্যে প্রস্তুত উপকরণরূপে। নতুন আদম বিশ্বাস করে সুচারুরূপে গৃহধর্ম পালনের যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠার জন্যেই নারীর শিক্ষা বিদ্যালয়গুলো ওই শিক্ষা দেয় না বলে নতুন আদম বিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচির ওপর মহাবিরক্ত হয়ে ওঠে। নূর মোহাম্মদ ওই ক্ষোভের এমন প্রকাশ ঘটায়, 'হায়, এ-দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। শিক্ষার এই মহাদোষের মূল্য উৎপাটন কবে হইবে কে জানে?' এবং 'ওই মহাদোষের মূল্য উৎপাটনের' দায়িত্ব সে নেয় নিজের হাতে।

নতুন বিবি নূরীকে তৈরি করে তার পতিপ্রভু। পতির দেয়া শিক্ষার গুণে সে জানে নারী জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং ওই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে খুব গর্ববোধ করতেও শেখে সে। সুশীলাও জানে নারী জীবনের উদ্দেশ্য কী। তবে তাকে তা জানায় তার পাঠশালার গুরুমাতা এবং তার জননী; পুরুষতন্ত্রের এই অনুচরেরাই সুশীলাকে 'সুশীলা ভার্যা' করে তোলার দাযিত্ব পালন করে। সুশীলা শিক্ষা পায় যে 'উত্তম গৃহিণী' হওয়াই নারী জীবনের লক্ষ্য আর 'উত্তম পাচিকা হওয়া স্ত্রীলোক মাত্রেরই সাতিশয় প্রয়োজনীয়।' উত্তম গৃহিণী হচ্ছে ওই নারী যার 'গৃহের একস্থানের সামগ্রী অন্য স্থানে কখনই' থাকে না, 'যেখানকার দ্রব্য সেইখানেই' থাকে। উত্তম গৃহিণী কদাপি কোন কাজে কোনমতে আলস্য' করে না। নারীর বাল্যকাল হচ্ছে উত্তম গৃহিণী হবার প্রস্তুতিকাল মাত্র। সুশীলার বাল্যকালে তাই কোনো অকারণ হুল্লোড় নেই, ক্রীড়া ও আমোদের কোনো অবকাশ নেই। তার অগ্রজেরা পায় ক্রীড়া আমোদের অঢেল স্বাধীনতা; কারণ তারা পুরুষ সন্তান; কিন্তু সুশীলার এমন স্বাধীনতা নেই। তার খেলাঘরেও তর্জনী উঁচিয়ে থাকে পুরুষতন্ত্র। খেলাঘরেও সুশীলাকে শিখতে হয় সংসারধর্ম পালনের বিধিবিধান। যেমন :

> রাঁধাবাড়া অর্থাৎ খেলাঘরে বালিকারা যে মিথ্যা রন্ধনাদি করিয়া আপন সন্তান-সন্ততিরূপে কল্পিত পুত্তলিরাশিকে খাইতে দেয়, এ-খেলা সে যেমন ভালবাসিত, অন্য খেলা তাহার তেমন প্রীতিকর ছিল না। গৃহধর্মের অনেক বিষয় এই খেলাতে শিখা যায়, একবার তাহার মাতা তাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, এ-জন্য খেলার সময় সে অন্যান্য বালিকাদিগকে ঐ খেলা খেলিতে কহিত।

খেলাঘরে যেমন তার নিস্তার নেই, তেমনি সর্বত্র সুশীলাকে আয়ত্ত করতে হয় 'স্ত্রীলোক' হয়ে ওঠার অসংখ্য নিয়মকানুন। সুশীলা 'বাল্যকাল অবধি গুরুপদেশ দ্বারা গৃহকর্মের পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা শিখিয়াছে'। তাকে শেখানো হয়েছে 'স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে গৃহকর্ম বিষয়ে সুশৃঙ্খলা পারিপাট্য এবং সুনিয়ম জানা'

'অত্যাবশক'। গৃহকর্ম বিষয়ে সুশৃঙ্খলা পারিপাট্য ও সুনিয়ম আয়ত্ত করার জন্যে বিদ্যাবতী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'বিদ্যাবতী বলেই তার সংসার সোনার সংসার। সুশীলা বিদ্যাবতী বলেই সে স্বামীর সংসার সুচারুরূপে পরিচালনা করতে পারে। অল্প আয় দিয়েও সুষ্ঠুভাবে সকল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় তার পক্ষে। সুশীলার গুণে 'ব্যঞ্জনের সামগ্রী তাহাদিগকে বড় একটা ক্রয় করিতে হইত না। কেবল মধ্যে মধ্যে মৎস্য ক্রয় করিলেই হইত। তাহাদের ঘরের পশ্চাৎভাগে কাঠা দুই জমি ছিল, সুশীলা তন্মধ্যে নানাপ্রকার ব্যঞ্জনের সামগ্রী উৎপন্ন করিত।' সুশীলা জানে 'দধি দুগ্ধ ঘৃত অতিশয় পুষ্টিকর এবং উপাদেয় খাদ্য' বলে তা দেহের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়। যে পরিবারের সকলের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে 'একটি সবৎসা গাভী' কেনার পরিকল্পনাই শুধু করে না, গাভীর কেনার প্রয়োজনীয় অর্থও সে পতিকে সরবরাহ করে। সুশীলা এমনই দক্ষ পরিচারিকা যে 'গাভীটির যে দুগ্ধ হইত' তার সবটুকুই 'আপনাদিগের ব্যবহারার্থ রাখিত' না, 'কিয়দাংশ বিক্রয়' করিত। এবং ক্রমশ 'গরুর খোরাক এবং পরিবারদিগকে নিয়মিত দুগ্ধ ব্যতিরেকে, সুশীলা দুগ্ধ বেচিয়া প্রতিমাসে তিনচারি টাকা সঞ্চয় করিতে পারিল। এতদ্ব্যতীত ঐ গাভী দ্বারা যে গোবর পাওয়া যাইত, সুশীলা তাহাতে ঘুঁট্যা দিয়া কাঠের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল'। সবজি খেতের আগাছা পরিষ্কারেরও দায়িত্ব পালন করে সুশীলা। 'সুশীলা সপ্তাহের মধ্যে দুইদিন তথাকার ঘাস উপড়িয়া ফেলিত এবং প্রয়োজনমতো কোন কোন স্থানে জল সেচনও করিত'। 'রন্ধনাদির' দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তাকে 'অবকাশমতো গৃহসজ্জা প্রস্তুত' করার দায়িত্ব পালন করতে হয়। 'দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া' সংসারের সকল 'ছেঁড়া নেকড়াগুলি উত্তমরূপে ধৌত' করে 'কাঁথা প্রস্তুত' করে। 'এবং পুরাতন তুলা সকল ঝাড়িয়া তদ্দ্বারা তিন চারিটি বালিশ প্রস্তুত' করে সে, 'ঘরের তাবৎ সামগ্রীগুলি যথাস্থানে পরিপাটিরূপে স্থাপিত' করে সে প্রমাণ করে যে সুগৃহিণী হবার জন্যে কতোটা মূল্য দিতে হয় নারীকে।

শুধু সংসার গোছালেই নারী উত্তম গৃহিণী হয় না, সংসার ধর্মের প্রতি যত্নের পাশাপাশি বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ির সেবাও তাকে করতে হয়। 'সুশীলা বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ির সেবাশুশ্রূষা করিতে কোন মতেই ক্রটি করিত না, তাহাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইত, সাধ্যমতো তখনই তাহা করিয়া দিত।' এমনকী সংসারের আয়-ব্যয়ের হিশেব বহনের ভার থেকেও সে পতিকে মুক্তি দেয়। ওই দায়িত্বও সে হাসিমুখে পালন করে। যেমন :

> নিত্য আহারের দ্রব্য সকল নিত্য কিনিতে হইলে সুলভ হয় না, অধিক ব্যয় হয়, এজন্যে সুশীলা প্রতিমাসের উপযুক্ত চাউল ডাইল নুন তেল মসলা প্রভৃতি দ্রব্য একবারে ক্রয় করিত। পরিবারের নিয়মিত ব্যয়

> কিরূপে সমাধা হইবে, এজন্যে চন্দ্র কুমারের কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। তাহার ধর্মপত্নী যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়া সকল নির্বাহ করিত এবং হিসাবপত্র সকলই রাখিত। স্বামী কেবল প্রয়োজন হইলে দ্রব্য সকল কিনিয়া দিতেন।

দেখা যাচ্ছে ধর্মপত্নী সুশীলা শুধু সহধর্মিনীই নয়; সে তার একটি শরীরে ধারণ করে অসুর শক্তি আর পালন করে বহু ভূমিকা। সে একইসঙ্গে ভাণ্ডারি, পাচিকা খাজাঞ্চি, মালী, রাখাল, ধোপিনী, ক্যাশিয়ার ও পরিচারিকা। কিন্তু তার মনে কোনো গর্ব নেই। পতির সন্তোষ বিধানই তার জীবনের লক্ষ্য এবং পতি তুষ্ট হলেই সে ধন্য বোধ করে :

> নাথ, আমি পতিসেবা এবং পতির সন্তোষ উৎপাদন করাকে এ-জাতের সার কর্ম বলিয়া জানি, পতি এবং গুরুজনদিগের তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্ত যে কায়িক পরিশ্রম, সে পরিশ্রমকে আমার পরিশ্রম বলিয়া বোধ হয় না।

এবং এরপরেও তার জন্যে থাকে পতিকে 'সামাজিক সুখ' দানের দায়িত্ব। 'কথোপকথন, আমোদ-প্রমোদ, বিদ্যানুশীলন, ধর্মালোচনা প্রভৃতি সকলই চন্দ্রকুমার তাহার গুণবতী ভার্যা সুশীলা সহবাসে সম্ভোগ করিতেন।' লেখক সুশীলা ভার্যার প্রশংসা করে রচনা করেন নানা বিস্ময়সূচক বাক্য। যেমন, 'বিদ্যাবতী সুশীলা ভার্যা সংসারের পক্ষে কি মঙ্গলদায়ক!' 'পাঞ্জাবদেশীয় কোহিনূর হীরা কত জ্যোতি ধারণ করে। বিদ্যাবতী ধর্মপরায়ণা স্ত্রীর জ্যোতি শত শত কোহিনূর অপেক্ষাও অধিক।' এ স্তুতিটুকু নারীর জন্যে নয়। পুরুষতন্ত্র কখনোই নারীর বন্দনা কিংবা মাহাত্ম্য কীর্তন করে না। সে নারীকে চিরঅচেতন করে রাখার জন্যে নানা কায়দা কৌশল প্রয়োগ করে এসেছে। এই স্তুতিটুকু ওই অচেতন রাখারই একটি অপকৌশল। কালিদাস প্রেমিকপুরুষের নারীতৃষ্ণা নিবারণের জন্যে প্রেমিকাকে নানা ভূমিকা পালন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। দয়িতা প্রেমিকপুরুষের শুধু প্রণয়ীই নয়, তাকে হতে হবে সখী, সচিব, মিত্র, বান্ধবী ও কামসহচরী, তবেই তৃষ্ণার্ত পুরুষের প্রাণ তুষ্ট হতে পারে। পুরুষের তুষ্টি সাধনের জন্যেই নারীর জীবন। নানারূপে নারী তাই পুরুষের সন্তোষ সাধন করে চলবে। আর সে থাকবে নিষ্কাম, আত্মবিলোপকারিণী সেবাব্রতী। যখন সে আসবে পুরুষের সংসারে, তখনও নানারূপে পুরুষের সন্তোষ সাধনই হবে নারীর জীবন। এবং নারীর ওই নানারূপের স্তব হচ্ছে তাকে সম্মোহিত ও অজাগ্রত রাখার ঘুমপাড়ানি গান।

গরীবের মেয়ে উপন্যাসে এই ঘুমপাড়ানি গান গাওয়ার আগে নতুন আদমকে পালন করতে হয় প্রশিক্ষকের দায়িত্ব। নারীকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দান করে সে এবং তৈরি করে নিজের মনমতো বা পুরুষতন্ত্রের ছাঁচমতো নতুন বিবি। এই নতুন

বিবির বড়ো গুণ হচ্ছে আনুগত্য। নতুন আদম চায় তার গড়া 'আদর্শ রমণী' তাকে মান্য করবে ঈশ্বরের মতো। এবং ওই 'আদর্শ রমণী' নামক নতুন বাঁদী তাকে ঈশ্বরের মতোই শক্তিমান বলে বিশ্বাস করে, আর তার পায়ে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেয়। নতুন আদম তার পরিচারিকাকে শেখায় অসংখ্য বিধিবিধান। তাকে সে দেখতে চায় এমন বিশ্বস্ত বাঁদীরূপে: যে একইসঙ্গে ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী, নার্স, ক্যাশিয়ার, ঝাড়ুদার, রাঁধুনি, ধোপিনী, গৃহশিক্ষিকা, পরামর্শদাত্রী ও হৃদয়রঞ্জিনী। নতুন আদম তার পরিচারিকাকে শেখায় স্বামী স্ত্রীর অভেদাত্ম ভাবের কথা, পারস্পরিক বিশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা, পর্দানশীল হয়ে ওঠার ফজিলত আর গৃহধর্ম পালনের বিধিগুলো। নতুন আদম জানায় তার অচরিতার্থ নানা বাসনা নিবৃত্তির জন্যেই সে নতুন বিবিকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু নতুন বিবির কোনো বাসনার কথা এ- উপাখ্যানে ব্যক্ত হয় না। নতুন বিবির কোনো কণ্ঠস্বর নেই, সে মূক ও চিরঅনুগত। আদেশ পালনকারী পরিচারিকার কণ্ঠস্বরের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। নতুন আদমের আদশে 'পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালনের' মধ্য দিয়ে সে নিজেকে সার্থক করে নতুন আদম কখনোই ভোলে না যে সে প্রভু। তার প্রতিটি বাক্য হচ্ছে আদেশ বাক্য। নব পরিণীতাকে উদ্দেশ্য করে। নতুন আদম যখন বলে :

> তুমি আগামীকল্য হইতে স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করিয়া দাও। স্কুলের সময় বাদ আমার বৃদ্ধা মাতার সেবা-শুশ্রূষা প্রাণপণে করিবে। মনে রাখিও তোমাকে বিবাহ করিবার আমার ইহা একটি প্রধানতম উদ্দেশ্য। তোমাদ্বারা আমার মায়ের পরিচর্যা সম্যকে সাধিত হইলে আমি তোমার প্রতি সর্বাধিক সন্তুষ্ট থাকিব।

তখন সে জানায় ওই সত্যটি যে, পতিপ্রভুর সন্তোষ বিধানই পরিচারিকার একমাত্র কাজ। জাগরণে নিদ্রায় গৃহকর্মে ও শয্যায় শুধু প্রভুর তুষ্টির জন্যে নিজেকে ঢেলে দেবে বাঁদী। পতিপ্রভু শুধু জাগর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না, নিয়ন্ত্রণ করে তার নিদ্রাকেও। অসংখ্য বিধির শৃঙ্খল পরিয়ে দেয় সুকৌশলে। নতুন আদম জানায় সংসারে সকলের সেবা করাই নারীর কাজ, আর নানাভাবে কৃচ্ছতা সাধন করার জন্যেই নারীর জীবন। সে আশ মিটিয়ে ঘুমাবার অধিকারও রাখে না। নতুন আদম এভাবে উপদেশ দেয়ার ছলে নারীকে বিধির শৃঙ্খল পরিয়ে দেয় :

> তুমি প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করতঃ নামাজ পড়িবে ও অফিজা পাঠ করিবে। উষা জাগরণ আয়ুবর্দ্ধক উষা নিদ্রা আয়ুনাশক।

নতুন আদম চায় পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী। তার 'আদর্শ রমণী' কে পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালির জন্যেও নানারকম উপদেশ তাকেই দিতে হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই

নতুন আদম এ- কথা বিস্মৃত হয় না যে, নতুন বিবি তার পদসেবিকা ছাড়া কিছু নয়। তাই তার প্রতিটি উপদেশে প্রভুর দম্ভ ও অবহেলাই প্রকটিত হয়ে ওঠে :

> তোমাব সঙ্গে মাকে জাগাইও না। তিনি যখন আপন ইচ্ছায় নিদ্রা হইতে উঠিবেন, তখনই তাহাব সম্মুখে প্রাতঃকৃত্যের পানি উপস্থিত করিবে। তুমি তাহার ওজু- গোসলের পানি ঠিক সময়মত তাহার সম্মুখে দিবে।... সময়ে পাক কবিয়া আগে মাকে খাওয়াইবে। পবে নিজে স্নানাহাব করিয়া স্কুলে যাইবে।

নূরীকে তার স্বামী 'ছাত্রবৃত্তি পাশ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে স্কুলে যাইতে হইবে', বলে নির্দেশ দেয়। তবে স্ত্রীকে বিদূষী করে তোলার মহৎ অভিপ্রায়ে এমন নির্দেশ দেয় না সে। স্ত্রীর স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারটি তার কাছে 'স্ট্যাটাস সিম্বল' ছাড়া আর কিছু নয়। সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে সংসারের দায়দায়িত্ব পালনের জন্যেই নারীর জীবন। এবং এ- কাজ নিজেকে উৎসর্গ করে যে সেই হচ্ছে 'আদর্শ রমণী'। ওই আদর্শ রমণী হবার জন্যে স্ত্রীকে সে এমন উপদেশ দেয় :

> মাব পীড়া বৃদ্ধির সংবাদে চিন্তিত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ রাত্রিতে ঘুমাই না, আমিও বলি ঘুমাইও না। এজন্যে কিছুদিন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিবে। মা'ব এই নিদারুণ পীড়ার সময় তুমি অহোরাত্রি তার পার্শ্বে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা কবিবে।... আমার পীড়িত মাতাব সেবা শুশ্রূষা যেন তোমার নবজীবনেব প্রথম পরীক্ষার বিষয় হয়। এ পরীক্ষায় তুমি তৃতীয় শ্রেণীতে পাস কবিলেও আমি সুখী হইব।

নতুন আদম নূর মোহাম্মদ শুধু নিজের আদেশ উপদেশ জারি করেই সন্তুষ্ট হতে পারে না; তাই তাকে আশ্রয় নিতে হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলীর। নূরীকে সে গৃহস্থালির কাজে কীভাবে পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভব সে বিষয়ে বিশদ উপদেশ দেয়। সে চায় একই সঙ্গে বহুভুজা নানারূপাকে; যে ঝাড়ুদার ধোপিনী হয়েও ধন্য বোধ করে :

> প্রত্যহ প্রাতে বান্নাঘর, সোম শুক্রে শয়নঘর চাদির মাকে দিয়া নিকাইয়া লইবে। এখানে ধোপার অভাব। ১৪ দিন পর পর কলার ক্ষারের সহিত সমপরিমাণ সোডা মিশাইয়া সকলের কাপড় ধৌত করিয়া লইবে। ওচলা আবর্জনায় ঘরদোর উঠান যেন অপরিষ্কার ও নোংরা হইয়া না থাকে। আমি উহা মোটেই সহ্য করিতে পারি না। তহুরা উচ্চবংশীয়া হইলেও অত্যন্ত নোংরা। এই মহাদুঃখে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি।

এতো অনুপুঙ্খ উপদেশ দিয়েও সে তুষ্ট হতে পারে না। নতুন বিবিকে আরো

বিশদভাবে দীক্ষিত করে তোলার জন্যে সে পাঠায় ভূদের মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ। এবং ওই গ্রন্থটিকে পারিবারিক জীবনের ধর্ম্মগ্রন্থ হিশেবে অবিরাম পাঠ করার জন্যে আদর্শ রমণীকে আদেশ দেয়। আদর্শ রমণীকে অবশ্যই হতে হবে উত্তম পাচিকা। তবে কোনো ব্যাপারেই বিবির ওপর নতুন আদমের আস্থা নেই। তার মনে এমন বিশ্বাস প্রোথিত যে নতুন বিবির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণা যেমন অস্পষ্ট, রন্ধন বিদ্যায়ও সে তেমনি অদক্ষ। নূর মোহাম্মদ তাই নিজেই হাতেকলমে রান্না শিখিয়ে দেবার জন্যে তৎপর হয়। নূরীকে শেখায় কীভাবে কোর্মার জন্যে মাংস টুকরো করতে হয়, পেঁয়াজ কাটতে হয় কোনভাবে আর কোন কোন মসলার সঙ্গে কী পরিমাণে পানি ও তেল মেশাতে হয় তার কৌশল। নূরী এ বিদ্যা পাঠশালা থেকে আয়ত্ত করতে পারে নি বলেই নূর মোহাম্মদ পাঠশালা বিদ্যাদান পদ্ধতির ওপর ক্ষুব্ধ হয়; এবং নূরীকে সকল বিষয়ে 'কর্ম্মশীল' করে তোলার প্রয়াস আরো জোরদার করে তোলে ক্রমশ :

> নূর সাহেবের শিক্ষা-দীক্ষায় অল্পদিনের মধ্যে নূরী এমন কর্ম্মশীল শিক্ষিত হইয়া ওঠে যে এখন নূর সাহেব নিশ্চিন্ত মনে বৈঠকখানায় বসিয়া আগন্তুক বন্ধু-বান্ধবের সহিত নানা প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন। তাহাদের পাক, পানাহার, পান-তামাক যেভাবে আবশ্যক যথাযোগ্যভাবে যথাসময়ে তাহা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

নূরী এমনকী পতিপ্রভুর শিক্ষার গুণে 'থট রীডার'ও হয়ে ওঠে। তাই 'নূর সাহেব মনে মনে যে সাধু সঙ্কল্প স্থির করেন, নূরী পূর্বাহ্নেই তাহার সফল সূচনা করিয়া রাখে, আবার নূর সাহেবের মনোবাসনায় যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, নূরী প্রকাশ্যে পানির মত সহজভাবে সে বিঘ্ন সরাইয়া দেয়।' ক্রমাগত দীক্ষার গুণে নিজের পরিচারিকা প্রতিভার আরো বিকাশ সাধনের ইচ্ছা ছাড়া নারীর হৃদয়ে অন্য কোনো সুপ্ত ইচ্ছা থাকে না। পতির কাছে সে শুধু একটি প্রার্থনাই করে :

> আপনার দেলে যখন যে সদ্ভাবের উদয় হইয়া থাকে দাসীকে মুক্তকণ্ঠে খুলিয়া বলিলে বড়ই সুখের কারণ হইবে। যাহা শিক্ষা দেন নাই, তাহা শিখাইবেন।

নারীকে এমন সম্মোহিত করে তোলাই ছিলো নতুন আদমের সাধ; উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেখে 'নূর সাহেব' 'বড় সুখানুভব' করে। কিন্তু যেহেতু কোনো অবস্থাতেই নারীর প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস পোষণ করে না পুরুষতন্ত্র: দীক্ষিত ও আত্মবিলোপকারী পরিচারিকার প্রতিও তাই বিশ্বাস নেই পুরুষতন্ত্রের এই অনুচরের। বরং মিথ্যে গুজব শুনেও সন্দেহে প্রাণ তাতিয়ে ওঠে। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত

নেয়, 'এখন উপায় কি ? ত্যাগ ব্যতীত গত্যন্তর নাই'। নাবীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই তার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় প্রভু। সকল ক্ষেত্রেই প্রভু সতর্ক থাকে নিজের সম্মান বক্ষার ব্যাপারে :

> সহসা তালাক দিলে অপবাদ এখনই গ্রামময বাষ্ট্র হইয়া পড়িবে- পরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তব, দেশ হইতে দেশান্তর, এই অপবাদ অপ্রকাশিত থাকিবে না। সুতবাং মনুষ্য সমাজে আর মুখ দেখান চলিবে না। অতএব একটু ধীবভাবে কৌশলেব সহিত পী পীয়সীকে বিসর্জন দেওয়াই কর্তব্য।

নূর মোহাম্মদেব এই স্বগত ভাবনা ও সিদ্ধান্ত জানায় নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের প্রকৃত মনোভাবটি। নাবী পুরুষেব চোখে চিরঘৃণ্য ও অবিশ্বাসিনী ছাড়া কিছু নয়।

'তুমি মহাজন, আমি তোমার খাতক': দেনমোহরের প্রহসন

নতুন আদম শুধু নতুন বাঁদীর ক্ষুধায় কাতরই নয়, তার ভেতরে আছে আরো অভিসন্ধিপরায়ণতা, শঠতা ও নারীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত। নারীকে আত্মবিলোপকারী, অচেতন মাংসপিণ্ড হবার মন্ত্রণা দেয় সে; একই সঙ্গে পুরুষের স্বার্থরক্ষার কাজটিও সে ভালোভাবে সম্পন্ন করে। নারীর সামান্য অধিকারও তার সহ্য হয় না, বরং ওই অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করার জন্যে সে উঠে পড়ে লাগে। নারী যাতে নিজেই স্বেচ্ছায় ওই অধিকার ত্যাগ করে, তার জন্যে চালায় নানারকম প্রচারণা। মহত্ত্বের নানা বানোয়াট কাহিনী ফেঁদে নারীকে বিভ্রান্ত হবার ফুঁসলানি দেয়। ইসলামী বিবাহ রীতিতে পাত্রীকে নানা অঙ্কের দেনমোহর দেয়ার প্রথা রয়েছে। এটি মূলত একটি কাগুজে প্রথা ছাড়া কিছু নয়, কারণ ওই অর্থ বাস্তবে নারীর হাতে এসে প্রায় কখনোই পৌঁছে না। পৌঁছুলেও তা নিয়ে নারী সটকে পড়ে না। স্বামীর সংসারে বাস করে ওই অর্থ ওই সংসারের জন্যেই ব্যয় করে। এই দেনমোহর ধার্যের ব্যাপারটি নতুন আদমের একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু যেহেতু নারীকে শৃঙ্খলিত করার কাজে ধর্ম তার প্রধান অবলম্বন, তাই ওই ধর্মীয় বিধিটির বিরুদ্ধাচারণ সে করে না। বরং দেনমোহর বিষয়ে নারীকে শোষণ করার ক্ষেত্রে সে নতুন করে ধর্মকেই ব্যবহার করে। ইসলামে নারীর দেনমোহর প্রসঙ্গটি নিয়ে রয়েছে চমৎকার প্রহসন। বলা হয়ে থাকে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে ও নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্যেই তৈরি হয়েছে দেনমোহরের প্রথাটি। তবে ধর্মীয় মহাপুরুষেরা নিজেদের বিবাহের সময় দেনমোহর হিশেবে ধার্য করেছেন যৎসামান্য অর্থ। এবং স্ত্রীর কাছে থেকে কোনো না কোনো সময়ে ওই টাকাটি মাফ করিয়ে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মহাপুরুষদের স্ত্রীদের ভাগ্যে জুটেছে শূন্য।

নতুন আদম নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে গ্রহণ করেছে ধর্মীয় মহাপুরুষদের ওই পথ অর্থাৎ প্রতারণার পথ। তবে নামমাত্র অঙ্ক সে নতুন বিবির দেনমোহর রূপে ধার্য করে নি। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির দিকে নতুন আদমের নজর ছিলো প্রখর;

তাই বিবাহ মজলিসের দেনমোহর হিশেবে ধার্য করতে সম্মত হয়েছে মোটা অঙ্কের মুদ্রা; কিন্তু তা করেছে কেবল দশজনেব কাছে নিজের 'ইজ্জত' বৃদ্ধিব জন্যে, নতুন বিবির প্রতি অনুবাগবশত নয়। বরং বিয়েব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যাবার পরপরই সে তৎপর হয়ে ওঠে ওই কাগুজে রীতির ভার থেকে মুক্ত হবার জন্যে। তবে এ-কাজটিও সে সম্পন্ন করে অতি কৌশলে। নতুন আদম দেনমোহব প্রসঙ্গটির নিষ্পিত্তি ঘটায় নতুন বিবির হাত দিয়ে, নিজে সে থাকে অভিভূত দর্শক মাত্র। আনোয়াবা, সালেহা, গরীবের মেয়ে- প্রতিটি রচনায় দেনমোহর প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নতুন বিবিদের প্রত্যেকেই দেনমোহরের দাবি হাসিমুখে ত্যাগ কবছে, কেননা পতির কাছে ভালোবাসা ছাড়া তাদের চাওয়ার আর কিছু নেই। পতির জন্যে তারা জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাহীন, সামান্য দেনমোহর ত্যাগ করা তো তুচ্ছ ব্যাপার। নতুন আদম পতিভক্তির এই দৃষ্টান্তের বিশদ বিবরণ দেন, কেননা এর মধ্যে দিয়ে সমাজের সকল নারীকে অমন আত্মোৎসর্গকারিণী হবার প্রচারণা চালান তাঁরা।

আনোয়ারাকে স্ত্রী হিশেবে পাবার জন্যে নূরুল এসলাম ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঞ্ছিতাকে বিবাহের কালে মোটা অঙ্কের দেনমোহর দিতে আপত্তি করে সে। ভালোবাসার চেয়ে অর্থই তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার কাছে। আনোয়ারার সঙ্গে এ বিষয়ে তার এমন কথোপকথন হয় :

> স্ত্রী : আপনাকে নগদ টাকা-পযসা কিছুই দিতে হয় নাই, কেবলমাত্র তিন হাজাব টাকাব কাবিন দিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, আপনি এই কাবিন দিতে অনেক ওজব-আপত্তি করিয়াছিলেন। আমাকে পাওয়া যদি এতই বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল তবে শুধু কাবিন দিতে এত ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন কেন।
>
> পতি : কাবিনে বড় ভয় হইয়াছে। বাপজান শেষে আবার বিবাহ করিয়া অর্ধেক তালুক কাবিন দিয়া গিয়াছেন; শুনিতে পাইতেছি মা নাকি সেই সম্পত্তি লইয়া পৃথক হইবেন। তিনি অর্ধেক ও আপনি তিন হাজার আদায় করিলে, কালই আমাকে পথে বসিতে হইবে।

'পতি দুঃখের স্বরে এ কথাগুলি বলিলেন' শুধু নিজের দুঃখ জ্ঞাপনের জন্যে নয়, আনোয়ারাকে 'মহৎ' হয়ে ওঠার উস্কানি দেয়ার জন্যেও লেখক নতুন আদম পতিপ্রভুকে দুঃখিত করে তুলেছেন। আনোয়ারা তার পতিপ্রভুকে এতোই ভালোবাসে যে পতির দুঃখ দূর করার জন্যে কাবিননামা ছিঁড়ে ফেলতেও তার কুণ্ঠা হয় না। এতে তার বিয়ের বৈধতা বিপন্ন হলেও কিছু যায় আসে না। পতির জন্যে নারী এরও চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, কাবিননামা ছেঁড়া তো সামান্য

ব্যাপার। তবে এমন আত্মত্যাগের সময়ও নারী গর্বিত হয় না। নারীর কোনো অবস্থাতেই গর্বিত হবার কোনো অধিকার নেই। চিরদিনের দাসী সকল অবস্থাতেই থাকে বিনীত ও কুণ্ঠিত। দ্বিধাজড়িত আনোয়ারা পতিকে সবিনয়ে নিবেদন করে : 'পত্রমধ্যে যে টুকরা কাগজগুলি পাঠাইলাম সেগুলি স্বহস্তে পোড়াইয়া ফেলিবেন। দাসীর বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা মাফ করিবেন।' আর পতিপ্রভু দাসীর মহত্ত্বে হয়ে ওঠে অভিভূত। কারণ এমন স্বস্তি সে বাঁদীর কাছে থেকে পাবার ব্যাপ্যারে সংশয়াম্বিত ছিলো। যদিও এমন হবার জন্যেই সে নারীকে ফুঁসলায়। পুরুষতন্ত্র নারীকে শেখায় নিজের যথাসর্বস্ব ছাড় দিয়ে হলেও পতিকে সুখী করাই নারীত্ব। নারী নিজেকে উজাড় করে দেবে, বিনিময়ে পতিপ্রভু তাকে দেবে স্তুতি ও প্রণয়– যা বানোয়াট ও মিথ্যে। চিঠির মধ্যে ছেঁড়া কাগজ দেখে পতি নূরুল এসলাম–

> বিস্মিত হইয়া কাগজগুলি যথাযথভাবে জোড়াতালি দিয়ে দেখিলেন, তাহা তাহার নিজ হস্তে লিখিত পূর্বকথিত সেই তিন হাজার টাকার কাবিননামা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নূরুল এসলাম অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তারপর স্বগত ভাবিলেন, প্রিয়ে, তুমি সত্য সত্যই স্বর্গের আনোয়ারা (জ্যোতির্মালা), তোমার তুলনা মর্ত্যে সম্ভব না

দেনমোহরের দাবি ত্যাগ করা ছাড়াও পতির জন্যে সতীকে আরো বহু কিছু করার দীক্ষা দেয় পুরুষতন্ত্র। পত্নী তার পৈতৃক ধনসম্পত্তিও ব্যয় করবে পতির প্রয়োজনে। তার নিজের বলে কোনো অর্থ থাকবে না। কেন-না নারীর হাতে অর্থ থাকুক এটা পুরুষতন্ত্র কখনোই অনুমোদন করে না। নারীর নির্ভরশীলতা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকেই পুরুষতন্ত্র এমন চক্রান্ত করেছে। সতীর সর্বস্ব হবে পতি, মুদ্রা নয়। মুদ্রা পুরুষের জন্যে, সতীর পৈতৃক ধনরাশিও পতির জন্যে। আনোয়ারাও তার পৈতৃক টাকাকড়ি অকাতরে টেনে আনে পতির জন্যে। পিতৃকুলের জন্যে তার কোনো মাথাব্যথা নেই; যদিও সে পিতার কন্যা; কিন্তু বিবাহের পর নারীর ওই পরিচয়কে গৌণ বলে গণ্য করতে শেখায় পুরুষতন্ত্র। বিবাহিতা আনোয়ারাও তাই পতিব্রতা সতীপত্নী ছাড়া কিছু নয়। যখনই প্রয়োজন পড়ে সে দাদীমার কাছে টাকা চেয়ে পত্র লেখে। তবে পতি যেহেতু পুরুষ, তাই চরম অর্থসঙ্কটেও পত্নীর টাকা নিতে সম্মত না হবার ভান করে; কেন না এমন করাকেই পৌরুষ বলে গণ্য করে পুরুষতন্ত্র। তখন সাধ্বী সতীকেই কাতর অনুনয় করে পতিকে সম্মত করতে হয়। নূরুল এসলাম যখন দাদীমা প্রেরিত টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন 'আনোয়ারার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে ছলছল নেত্রে ঊর্ধ্বে তাকাইয়া কহিল, তবে আমি কি পর ? আমার জিনিস কি আপনার নয় ?' শুধু ক্রন্দন নয়, আনোয়ারা নানাভাবে মিনতিও করে চলে। তবেই পুরুষের পক্ষে পত্নীর টাকা গ্রহণের গ্লানি

বরণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। 'আনোয়ারার সনির্বন্ধ অনুরোধে নূরুল এসলাম শেষে টাকা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন' এবং 'পত্নীর পতিপ্রাণতায় তাহার চিত্তের ভার কমিয়া গেল।' 'পতিপ্রাণা আনোয়াবা' যেমন 'পতির মনোভাব বুঝিয়া তাহার চিন্তা নিজ হৃদয়ে ধারণ' করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে; প্রতিটি নারীকে তেমনি পতির 'চিত্তের ভার' দূর করার নসিহত দেয় পুরুষতন্ত্র।

আনোযাবার লেখক দেনমোহর প্রসঙ্গে শরীয়তের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন নি, তিনি পত্নীর 'পতিপ্রাণতার' ওপর জোর দিয়েছেন। তবে সালেহার রচয়িতা অত ভাবালু প্রেমবাদী নন। তিনি শরীয়ত থেকে নানা উদাহরণ সংগ্রহ করে আটঘাট বেঁধে নারীকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি ধর্মশাস্ত্র থেকে নানা বচন উদ্ধৃত কবেছেন, পতিঅনুগত পত্নীর সামনে পতির মনোবেদনাকে মেলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন সাধ্বী পত্নী হয়ে ওঠার জন্যে দেনমোহরের দাবি ত্যাগ করা কতো জরুবি। জোহবা ধনী কন্যা, শিক্ষিতা। সে প্রেমে পড়ে এক দরিদ্র মেধাবী যুবকের এবং বিবাহের পর তার স্বামী ঘরজামাই হিশেবে তাদের বাড়িতে বসবাস করতে থাকে। পত্নী জোহরার মনে একরত্তি অহংকার নেই, সে পতি অনুগত ও চিরবিনম্রা। সে নিজেকে পতির অধীনা বাঁদী ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে তার কথোপকথন এমন :

> আমি তো আপনাব সহতাজ (অধীনা)।
> কি করে ?
> নামে আমাব যে সব আছে, কাজে সে সব আপনাব'
> সে আবার কবে হতে ?
> যেদিন হতে আমি আপনাব বাঁদী।

কিন্তু স্ত্রী নিজেকে বাঁদী বলে ঘোষণা করলেও পতি মনে কিছুমাত্র স্বস্তি জাগে না। কারণ পত্নীকে সে কখনো বিশ্বস্ত বলে গণ্য করতে পারে না। পুরুষতন্ত্র কখনোই নারীকে বিশ্বাস করে না। পতি তাহের সারাক্ষণ নিজেকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। স্ত্রীর কাছে ঘোষণা করে 'আমিই তোমার খাতক, তুমি মহাজন'। কেন না তাকে বিবাহে ইসলামী প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে দিতে হয়েছে বড়ো অঙ্কের দেনমোহর। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে এমনটি করলেও এটি হয়ে ওঠে তার মহাঅসুখের কারণ। যদিও ধনী কন্যা জোহরাকে বিয়ে করার সুযোগ পেয়ে সে প্রচুর ধনরত্ন যৌতুক হিশেবে পায়। এমনকী তার মৃত শ্বশুর কন্যাজামাতার 'যা ভোগ্য তার তালিকা' 'রেজিষ্ট্রিকৃত বণ্টননামায়' বিশদভাবে লিপিবদ্ধও করে যায় এবং সে ওই সবকিছুর মালিক হয়ে ওঠে। তবুও স্ত্রীর প্রাপ্য দেনমোহরের দায়ভার থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। নানা ছল-ছুঁতোয় ওই কথা স্ত্রীকে

জানাতে চাইলেও তার পৌরুষ তাকে বাধা দেয়। ভণ্ডকে মহৎ করে তোলার জন্যে এমন অজুহাত দেখানো পুরুষতন্ত্রের একটি ছল। তবে পুরুষতন্ত্র রটায় যে সতী বিচক্ষণ পত্নী সবসময়ই ইঙ্গিত থেকেই পতির মনোভাব বুঝে নিতে পারে বা বুঝে নেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। জোহরাও এর ব্যতিক্রম নয়। জোহরা দেনমোহরের দায়ভার থেকে পতিকে মুক্তি দেয়ার জন্যে উপায় খোঁজে। 'স্বামীকে সে বিষয়ে সান্ত্বনা দিবার জন্য জোহরা প্রায়ই সুযোগ অন্বেষণ' করে। সুযোগ পাওয়া মাত্র স্বামীকে এই বলে আশ্বস্ত করে :

> মাফ করুন, এমন কথা বলবেন না, সেটা শরিয়তের বাঁধুনী মাত্র। কাবিননামা ফেরৎ দিলে বা ছিঁড়ে ফেললে মাফ করা হয় না বলে এতদিন তা করি নাই। ইরাদা আছে, একদিন মা ভায়ের মেজাজ বুঝে, তাঁদিকে সাক্ষী রেখে খোলাসা-মনে জবানী একবাবে দ্যায়েন মোহর মাফ করে দোব।

তবে মনেপ্রাণে দেনমোহরের দায় থেকে মুক্তি চাইলেও স্ত্রীর প্রথম অনুরোধেই সম্মত হওয়া পুরুষোচিত নয় বলেই ফতোয়া দেন লেখক। তাঁর নায়কও তাই পত্নীর অনুরোধ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে প্রত্যাখ্যান করে। পৌরুষ প্রদর্শনের জন্যে ভণ্ডামিকে গ্রহণযোগ্য বলে রায় দেয় পুরুষতন্ত্রের অনুচরেরা। একই সঙ্গে ওই সময়ে নারীর করণীয় কর্ম সম্পর্কেও বিশদ নির্দেশ দেন। নারীকে তখন অবশ্যই সকাতরে বিনীত বচনে দয়া প্রার্থনা করতে হবে। জোহরাও তাই করে। সে 'নতমুখে নম্রস্বরে' বলে :

> মাফ করবেন। কোরান-হাদিসে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকাব বলে আমি বলতে সাহস করেছি যে, দ্যায়েনের বিনিময়ে স্ত্রী গ্রহণ করা এবং ঐ দ্যায়েন আদায় দেওয়া মুসলমান পুরুষদিগের জন্যে ফরজ। ইহার অন্যথা কবিবার অধিকার তাদেব নেই একথা সত্যি: কিন্তু যদি তাবা (পত্নীগণ) স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদিগকে উহার (স্ত্রীধনের) এক অংশ ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে আনন্দেব সহিত কল্যাণকর ফলস্বরূপে উহা উপভোগ করে। কোবানের এই উপদেশ তো তারা মানতে পারেন। এতে আর কোনও দোষ নাই।

স্ত্রীর মুখে 'কোরান বর্ণিত ভক্তিপূর্ণ সাময়িক উত্তর শুনিয়া' তাহের 'সাতিশয় চমৎকৃত' হয় এবং দয়া করে দেনমোহরের দাবি ত্যাগের জন্যে ব্যগ্র স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করে স্ত্রীকে ধন্য করে। স্ত্রীকে একইভাবে বঞ্চিত করার সুযোগ খোঁজে গরীবের মেয়ে উপাখ্যানের নায়ক নূর মোহাম্মদ। নূর মোহাম্মদ পরিণত বয়স্ক এবং নূরী তার দ্বিতীয় স্ত্রী। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের যৎসামান্য দেনমোহরের দায়ভার বহনেও

প্রবল অনীহ ওই নতুন আদম। পদসেবিকা পরিচারিকাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েই ধন্য করতে চায় পুরুষপ্রভু, তাদের জন্যে অর্থ ব্যয়ের কোনো তাগিদ তারা বোধ করে না, বরং দেনমোহর তাদের কাছে গণ্য হয় মহাচাপরূপে।

নূর মোহাম্মদও নানা ছুঁতো খুঁজতে থাকে দেনমোহর মাফ করিয়া নেবার জন্যে। রাতে শোবার সময় নানা ছুঁতোয় ওই প্রসঙ্গটি তোলার চেষ্টা চালায় পতিপ্রভু। পত্নীকে কৌশলে প্রশ্ন করে, 'তোমার ধন কি সমস্ত আমাকে দান করিতে পার ?' এ- প্রশ্নের পেছনে কাজ করেছে যে অভিসন্ধি তা এমন, 'নূর সাহেব ভাবিয়াছিলেন নূরীর ত পৈতৃক ধন এক কপর্দকও নাই, সুতরাং সম্ভবতঃ বলিবে, আমার কি আছে যে তাহাই আপনাকে দান করিব ? আমি তখন বলিব, তোমার পাঁচশত টাকার কাবিন আছে, আমাকে তাহা হইতে মুক্তি দাও'। শুধু দেনমোহরের দায় থেকে পতিকে মুক্তি দেয়াই প্রকৃত পতিব্রতার কাজ নয়, সকল ধন সম্পত্তি স্বামীকে অর্পণ করাও পতিব্রতার কাজ। এভাবেই পতিব্রতা প্রকৃত নারীধর্ম পালন করতে পারে। পুরুষতন্ত্রের এই অপপ্রচার পাওয়া যায় মনোয়ারা উপন্যাসে। মনোয়ারা ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। কিন্তু একমাত্র সন্তান হলেও পিতার অর্থ সম্পদের মালিক হবার যোগ্যতা তার নেই, কেননা সে নারী। ওই সম্পদের অধিকার লাভ করে মনোয়ারার স্বামী শামসুল আলম। মনোয়ারার পিতা 'সওদাগব সাহেব কন্যা-জামাতার অকৃত্রিম প্রণয়প্রীতি দর্শনে যারপরনাই পুলকিত। তিনি তাহার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি জামাতার নামে দানপত্র লিখিয়া সাংসারিক কাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে'। মনোয়ারা এ- ব্যবস্থায় অসুখী হয় না, বরং গৌরব বোধ কবে। এতে নিজেকে পতিব পদতলে নিঃশেষে বিলীন করে দিয়ে নারীজন্ম সার্থক করা সম্ভব হয় বলে পুরুষতন্ত্র প্রচার করে। মনোয়ারাও এ-ভাবে নিজেকে কৃতার্থ করেছে।

'প্রাণেশ, আমি আপনার পদসেবিকা'

এ উপাখ্যান চারটির আখ্যানে কিংবা নারীভাবমূর্তি তৈরির ক্ষেত্রেই যে কেবল পুরুষতন্ত্রের প্রবণতা ও অভিসন্ধির পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে তা নয়। উপাখ্যানগুলোতে পাওয়া যায় এমন অসংখ্য বাক্য যেগুলো কোনো না কোনোভাবে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ার হিশেবে তৈরি হয়েছে। নারীর বোধ বিশ্বাসকে অচেতন করে তোলার জন্যে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিরা রচনা করেছেন বহু আপ্তবাক্য। নারীর চেতনাকে খঞ্জ করে রাখার জন্যে ওই বাক্যাবলী ছড়িয়ে গেছে বিষ। নারীকে অবশ্যই অতিসহিষ্ণু হতে হবে বলে পুরুষতন্ত্র প্রচারণা চালিয়েছে। সে সহ্য করবে পুরুষের নিষ্ঠুরতা, সহ্য করবে দুর্দশা, দারিদ্র্য, এমনকি সতীনের অত্যাচার; পতি তার পরমারাধ্য দেবতা ঠিকই কিন্তু সে কখনোই পতির সমতুল্য নয়। নারী সর্বদা পতির পদসেবিকা বা অধঃস্তন প্রজা মাত্র। নিচে পুরুষতন্ত্রের চরদের মনোভাবের কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল :

ক. সোয়ামীর মানে মেয়েদের মান বাড়ে।

খ. ধৈর্যই নারীর প্রকৃত ভূষণ, এ ভূষণ যাহার নাই, সেই রাজরানী হইলেও অধমা। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আজ হইতে সতীনের অত্যাচার বরণ করিয়া লইলাম।

গ. প্রিয়তম, স্বামীন! অভিন্ন হৃদয় প্রাণেশ,... আপনার সুখের জন্যেই আমার জীবন, আপনার সুখেই আমার সুখ।... দাসীর শেষ প্রার্থনা, খোদাতায়ালার অনুগ্রহে আপনি বিবাহ করিয়া চিরসুখী হউন; কিন্তু দাসীকে চরণছাড়া করিবেন না।... আমি কলঙ্কিনী হইলেও আপনার দাসী।

ঘ. নাথ! প্রজার কাছে রাজা ঋণী; অমন কথা বলিবেন না, প্রাণেশ, আমি আপনার পদসেবিকা।

ঙ. পতি সেবাই সতী জীবনের সম্বল।

চ. প্রাণেশ্বর! এ দাসীর সেবা শুশ্রূষার যদি কোন প্রকার ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে তাহা নিজগুণে 'ক্ষমা করিয়া আজীবন কাল পদাশ্রয়ে রাখিবেন, আমি আর কিছুই চাহি না।

ছ. স্বীকার করি তুমি আমার প্রজা, প্রিয়ে তোমার সুকৃতির পরিচয় যে রাজার কাছেও পাওয়া অসম্ভব।

নতুন আদমের নবরূপ

মনমতো বিবিবাদার ক্ষুধা মেটার পব নতুন আদম সমাজ সংসারেব জন্যে হিতকর নানা কাজ করার তাগিদ বোধ করে। সে চায় সমাজের মান্যগণ্য একজন হয়ে উঠতে। চায় সামাজিকগণের মুখে মুখে তার যশঃগাথা কীর্তিত হোক। সে বিশ্বাস করে সে শ্রেষ্ঠ, সমাজের সকল সাধারণের চেয়ে ভিন্ন; সে কীর্তিমান ও যোগ্য বলেই তার প্রাপ্য হচ্ছে প্রশংসা ও যশ। সে অন্য সকলের চেয়ে ভিন্ন কেন না সে বিদ্বান। নিজের যোগ্যতায় সে অর্থশালী হয়ে উঠেছে, তাই সে শক্তিমান। সে নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছে অভিনব নতুন বিবি, তার সমাজের অন্যরা তা পারে নি। এই সাফল্যও তার মধ্যে সংগোপনে জাগিয়ে দিয়েছে প্রবল আত্মবিশ্বাস। ব্যক্তিগত জীবনে কাঙ্ক্ষিত লাভের পর সে পেতে চায় সামাজিক প্রতিপত্তি। ব্যক্তিগত ক্ষুধা নিবৃত্তির পর তাকে কামড়ে ধরে সমাজে মান্যগণ্য হবার ক্ষুধা। সে এখন শুধু বিদ্বান বলে পরিচিত হয়েই তুষ্টি পায় না; সকল সামাজিকের কাছে প্রবল বিদ্যোৎসাহীরূপে খ্যাত হতে চায়। সে নিজেকে ব্যাপৃত করে লোকহিতকর নানা কাজে; কেন না সে প্রসিদ্ধি হতে চায় পরম লোকহিতৈষীরূপে। সে নিজের বিত্তবৈভব জাহির করতে চায়। তবে নিরক্ষর বিত্তশালীদের মতো স্থূল কোনো ছুতোয় সে নিজেকে জাহির করে না। নিজের সম্পন্নতার পরিচয় তুলে ধরার জন্যে সে বেছে নেয় লোকহিতকর নানা ছুতো।

নতুন আদম বিদ্যা ও অর্থবিত্তকেই সমাজের মান্যগণ্য হবার উপায় বলে গণ্য করে। বিদ্যাহীন বিত্তবানকে সে মূর্খ বলে তাচ্ছিল্য করে, আর বিত্তহীন বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি সে করুণা পোষণ করে। কর্মজীবনে নতুন আদমের একমাত্র লক্ষ্য থাকে অধিগত সামান্য বিদ্যার সাহায্যে সৎপথে থেকে বিত্তবান হয়ে ওঠে। আনোয়ারা, মনোয়ারা, সালেহা, গরীবের মেয়ে উপন্যাসের নায়ক নব্য আদমদের জীবনের পরিণত পর্যায়ে দেখা যায় ওই সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের অভিলাষ। ওই অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে তারা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সফল হয়। তারা গ্রামে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠার জন্যে মসজিদ বানায়, পুকুর প্রতিষ্ঠা করে, জাঁকজমকের সাথে ভোজ দেয়, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে এবং সকলের

মুখে 'ধন্য ধন্য' রব শুনে পরম সন্তোষ লাভ করে। স্বল্পশিক্ষিত ওই বাঙালি মুসলমান গোত্রটির মনে উচ্চশিক্ষার শীর্ষে না পৌঁছুবার কারণে কোনো ক্ষোভ নেই, ব্যর্থতা বোধ নেই। পৃথিবী জুড়ে তার সময়ের চেতনার জগতে চলছে যে-আলোড়ন ও রূপান্তর, সে- বিষয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। তার চেতনা কেন্দ্রীভূত নিজের ক্ষুদ্র জীবনে। ইসলামের মলিন দশা নিয়ে শোক তাপ করা ছাড়া সে কোনো কিছুই চিন্তা করে না। এই শ্রেণীটিকে আমরা প্রথম পর্যায়ের নতুন আদম বলে অভিহিত করতে পারি। নূরুল এসলাম, নূর মোহাম্মদ, শামসুল আলম, আবু তাহের প্রমুখ নায়কেরা ওই শ্রেণীটির প্রতিনিধি হিশেবেই উপন্যাসগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে।

নূরুল এসলামের ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে আছে বহু ওঠাপড়া, তবে সবশেষে তার জীবনে আসে স্থায়ী সচ্ছলতার কাল। ওই সচ্ছলতা সে আয়ত্ত করে নিজের বিদ্যা ও কঠোর পরিশ্রম দিয়ে। রতনপুরের পৈতৃক বসতভিটায় 'দ্বিতল অট্টালিকা' নির্মাণ করেই সে তুষ্ট হতে পারে না, তাকে তাড়িত করে সমাজের 'মাথা' হবার সাধ; তাই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক সমাজিক জনহিতকর কর্মকাণ্ডে। তার সমাজের জনসাধারণকে অভিভূত করার মন্ত্রটি সে ভালোভাবেই জানে। নিজেকে সে সর্বাগ্রে অতি ধর্মপরায়ণ মুসলমান হিসেবেই জাহির করতে চায়। এটি হচ্ছে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা ও সমর্থন আদায়ের সস্তা কৌশল। সে এবং নব্য আদমের সকলেই আগে নিজেকে খাঁটি মুসলমান হিশেবে দেখতে পছন্দ করে, তারপরে সে ভাবে তার মনুষ্যসত্তার কথা। নূরুল এসলাম নিজের 'বহির্বাটিতে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এক পরম রমণীয় প্রকাণ্ড মসজিদ' নির্মাণ করে এবং 'সর্বসাধারণের পানির ক্লেশ নিবারণের জন্যে সম্মুখে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী' খনন করায়। এগুলো হচ্ছে তার সম্পন্নতার স্থায়ী নিদর্শন। তবে সে জানে শুধু এই স্থায়ী কীর্তির সাহায্যে সকলের কাছ থেকে উচ্চকণ্ঠ স্তুতি পাওয়া যাবে না। সে বিশ্বাস করে সমাজে গণ্যমান্য হবার জন্যে একটি গণভোজ দেয়া অতি জরুরি। তাই 'মসজিদ ও পুষ্করিণী' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজন করে এক 'মিলাদ উৎসবের।' ওই মিলাদ উৎসব 'রাজসূয় যজ্ঞে'র তুল্য। তাতে নিমন্ত্রিত হয় আশপাশের সকল গ্রামের মানুষ। আয়োজন ও ধুমধামের ব্যাপকতা বোঝাবার জন্যে পাঠকদের উদ্দেশ্য করে লেখক বলেন, 'আপনারা জানিয়া রাখুন, আনোয়ারা এই ব্যাপারে ১০/১২ সের হরিদ্রা ব্যয়ের অনুমান করিয়াছিল, তাহার স্থলে অর্ধমণ হরিদ্রা খরচ হইল।'

এই 'মিলাদ উৎসবে নূরুল এসলাম ও আনোয়ারার যাবতীয় আত্মীয়স্বজন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া' আসে; আর আসে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ। রতনদিয়ার চতুঃস্পার্শ্বস্থ দশবারো গ্রামের লোক, বেলগাঁও বন্দরের যাবতীয় হিন্দু মুসলমান, স্বয়ং জুটের ম্যানেজার সাহেব এই মহামিলাদে নিমন্ত্রিত হইয়া'

আসেন। 'তদ্ব্যতীত রবাহূত, অনাহূত অগণিত লোক এই মহোৎসবের উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই রসপূরিত ভোজ্য তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল।' উদরপূর্তির মধ্য দিয়ে সকলকে বশীভূত করেই ক্ষান্ত হয় না নূরুল এসলাম। এই নব্য বিত্তবান নিজের বিত্ত ও ঔদার্য প্রদর্শনের এমন সুযোগ হাতছাড়া করে না। সে দরিদ্রদের অকাতরে ধনদান করে চলে। এর মধ্যে দিয়ে সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠার ও নিজের মহিমা বৃদ্ধির পথ তৈরি করে সে। সে চায় সকলের মুখে তার শক্তি, মহিমা ও যশের কথা উচ্চারিত হোক; সমাজের মহাউপকারী বান্ধব হিশেবে সকলেই তাকে মান্য করুক। তাই সকলকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করিয়া 'দানহীন কাঙালদিগকে যথাযোগ্য অর্থ ও বস্ত্র দান করা' হয়। এ-ভাবে তার উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হয়। দরিদ্র ক্ষুধার্তদের মুখে সে নিজ নামে জয়ধ্বনিই শুধু শোনে না, শোনে বিবিবাঁদী আনোয়ারার নামেও জয়ধ্বনি। 'দানপ্রাপ্ত ভোক্তা হর্ষবিহ্বল চিত্তে দলে দলে' 'ধন্য আনোয়ারা বিবি' 'ধন্য দেওয়ান সাহেব' রবে প্রতিধ্বনি তুলিয়া রতনদিয়া মুখরিত করিয়া তুলিল'। নতুন আদম নিজের সম্পর্কে পোষণ করে অতি উঁচু ধারণা। আর সে চায় জনকণ্ঠে উচারিত হোক তার জীবনের কিংবদন্তি। তার বদান্যতা, ঔদার্য, শিক্ষানুরাগ, উদ্যম, সাফল্যের গাঁথা শুনেই সে তৃপ্ত হয় না, একইসঙ্গে সে শুনতে চায় তার অতুল্য দাম্পত্যজীবনের বন্দনা। ওই দাম্পত্যজীবনের স্রষ্টা সে নিজে এবং ওই দাম্পত্যজীবন নিয়ে তার গর্বের সীমা পরিসীমা নেই; কারণ ওই জীবনে তার আছে অতি আত্মবিলোপ দক্ষ বাঁদী। 'মলয়ানিল সংযোগে পুষ্পসৌরভের ন্যায় প্রেমশীল দম্পতির পুণ্য কাহিনী দেশদেশান্তরে বিঘোষিত হইতে' শুনে তাই নূরুল এসলামের প্রাণ আনন্দে ফেঁপে ওঠে।

এ- আনন্দ শুধু নূরুল এসলামের একার নয়, নতুন আদমের সকলেই এমন আনন্দ পেতে চায় এবং লাভ করে। শামসুল আলমও বিত্তশালী হয়ে পরিণত বয়সে 'দেশে' আসে। সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন তারও মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকাশ্যে সে জনসেবায় নিজেকে সঁপে দেয় নিঃস্বার্থভাবে। সে 'দেশে আসিয়া জন্মভূমির গৌরব সাধনে তৎপর হইল। প্রথমে তাহার কল্যাণকামী চক্ষু গ্রামের জুম্মা মসজিদটির উপর পড়িল। মসজিদটি সংস্কারাভাবে ধরাশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে তাহাকে আবার সুরম্য অট্টালিকায় পরিণত করিল'। নিজেকে পরম ধার্মিক ও ধর্মের একনিষ্ঠ সেবকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়েই গণ্যমান্য হবার শক্তপোক্ত ভিত্তিটি গড়ে তোলে নতুন আদম। তারপর নিয়োজিত হয় জনগণের ইহলৌকিক 'তুচ্ছ' সমস্যাগুলোর সমাধানের কাজে। শামসুল আলমও এর ব্যতিক্রম নয়। সে মসজিদ সংস্কার সম্পন্ন করে 'তৎপর জলের কষ্ট দূরীকরণার্থ সুবৃহৎ দুইটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিল। গ্রামে সুন্দর সুন্দর রাস্তা

নির্মাণ করাইয়া দিল।' গ্রামবাসীর ইহজগতের বড় অসুবিধা দূর করার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার পর এই ধনাঢ্য দুঃস্থ জনগণের দারিদ্র্য দূর করার জন্যে নগদমুদ্রা দেয়ার ব্যবস্থাও করে; 'গ্রামের গরীব দুঃখীদিগকে বিস্তর টাকা দান খয়রাত দিয়া তাহাদের কষ্ট; দূর কবে। আর জনমণ্ডলী তার দয়ায় 'মুগ্ধ হইয়া দম্পতিদ্বয়ের প্রশংসাকীর্ত্তন ও কুশল কামনা'য় আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। এই উচ্চকণ্ঠ বন্দনাই নতুন আদমের পরিণত বয়সের প্রধান কামনা। তবে এ- অংশ বর্ণনার সময় লেখক নতুন আদমও মুগ্ধ জনগণের মতোই যে বিহ্বল দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাই শামসুল আলম ও মনোয়ারা এই দুজনকে এক দম্পত্তি বলে অভিহিত করার বদলে তিনি নির্দেশ করেছেন 'দুই দম্পতি' বলে। স্বামী ও স্ত্রী এই দুই সদস্য মিলে গড়ে তোলে দাম্পত্য জীবন এবং নিজেরা চিহ্নিত হয় দম্পতি বলে। এই বিভ্রান্তি যে আনন্দ বিহ্বলতার কারণে এমন নয়। এমন ভ্রান্তি র মূল্যে রয়েছে লেখক নতুন আদমের অল্পশিক্ষা ও অজ্ঞানতা।

এরপর নিজেকে শিক্ষানুরাগীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থাও সম্পন্ন করে শামসুল আলম। নূরুল এসলামও নিজেকে বিদ্যোৎসাহী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে ভুল করে নি। সে অন্তঃপুরের পাশে তৈরি করে দেয় মেয়েদের একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা। বিবি আনোয়ারা সেখানে বালিকাদের বিদ্যা শিক্ষা দেয়, আর নূরুল এসলাম থাকে আরো মহৎ ভূমিকায়। সে স্ত্রীশিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকের মহান ভূমিকা পালন করে। শামসুল আলমও পালন করে ওই মহান ভূমিকা। তার 'গ্রামে উচ্চ ইংরাজী স্কুল ছিল না ও বালিকা বিদ্যালয় ছিল না।' দানশীল এই হাতেম তাঈ এখন 'দশ সহস্র টাকা ব্যয়ে, একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিল'। গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দান করে যদিও সে; কিন্তু তার গোপন অভিলাষ অপূর্ণ থাকে না। কৃতজ্ঞ গ্রামবাসী 'তাহার বদান্যতায়' অভিভূত হয় এবং 'শামসুল আলমের পবিত্র স্মৃতি রক্ষাকল্পে তাহার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলের নাম শামসুল আলম হাই স্কুল রাখিল এবং বালিকা বিদ্যালয়টি 'মনোয়ারা গার্লস স্কুল' নামে অভিহিত হইল।' যেহেতু সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনই নতুন আদমের পরম কামনার ধন, তাই ওই পথে প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্যে শামসুল আলম অকাতরে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হয় না। 'সে বহু অর্থ ব্যয় ও শারীরিক অশেষ পরিশ্রম দ্বারা জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল' করে বলে লেখক জানান। তবে সে আসলে এভাবে উজ্জ্বল করে তার পরিণত জীবনকে। এভাবে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করে বদান্য, দানশীল, বিদ্যাব্রতী সমাজহিতৈষীতে।

নূর মোহাম্মদও অনুসরণ করে একই পন্থা। প্রৌঢ় বয়সে কর্মজীবনে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে সে ব্রতী হয় 'লোকহিতকর কার্য্যে'। নিজের গ্রাম কুসুমপুরে সে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজেকে সঁপে দেয়। ইমারত প্রস্তুতের আগে সে জনগণের চেতনার

জাগবণ ঘটানোর কাজে নামে। প্রথমে সে 'অজ্ঞানবদ্ধ কুসুমপুর অঞ্চলের লোকগণকে একমাস যাবৎ নানা স্থানে সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতা ও উপদেশ দানের' মধ্য দিয়ে বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে। তারপর উদ্যোগ্য নেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। অজ্ঞ নিরক্ষর মুসলমানদের, 'সন্তানগণের সুশিক্ষার্থে একটি জুনিয়র মাদ্রাসা খুলিয়া' দেয়। সে অন্যদের মতো শুধু অর্থসাহায্য করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতাই করে না, সে সক্রিয় ভূমিকাও পালন করে। অন্য নব্য আদমের তুলনায় নূর মোহাম্মদ অনেক বেশি সক্রিয় এবং নিয়ন্ত্রক। সমাজনিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠা তার অভিপ্রায় এবং ওই নিয়ন্ত্রণ কার্য সে পরিচালনা করতে চায় নিজে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তাই মাদ্রাসা পরিচালনা করে সে নিজ হাতে এবং 'নিয়মিত তত্ত্বাবধান দ্বারা অল্পদিনেই উহার সাফল্য ও উপযোগিতা জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া' দেয়।

নারীশিক্ষার জন্যেও নূর মোহাম্মদ থাকে একইরকম তৎপর। সে 'নিজ বাড়ীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া' গ্রামের মেয়েদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করে, স্ত্রী নূরীকে দেয় শিক্ষকতার দায়িত্ব আর নিজে পালন করে পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা। সে সমাজের সকল অঞ্চলে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। শিক্ষানুরাগী সমাজসেবক ব্রতী হয় গ্রামেব বড়ো বাস্তব সমস্যা দূরীকরণে। গ্রামবাসীর জলকষ্ট নিবারণের জন্যে সে পুকুর খনন করায়, আর 'পানির পূর্ণ অভাবের সময় কুসুমপুরের লোক অচিন্ত্যরূপে পানের উপযুক্ত পানি প্রাপ্ত হইয়া নূর সাহেবের নামে জয়ধ্বনি' দিতে থাকে। নতুন আদমের অতি কামনার ধন হচ্ছে জনকণ্ঠের ওই জয়ধ্বনি; নূর মোহাম্মদ তা একটু বেশি করেই পায়। কারণ সমাজ সেবায় নিজেকে সে বিলিয়ে দেয় সকলের চেয়ে বেশি। তবে শুধু সমাজের দুর্দশা দূর করাই তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে না। সে তাকায় আরো দূরে, তার লক্ষ্য আরো দূরপ্রসারী। 'মোসলমান জাতির' দুরবস্থা তাকে পীড়িত করে। তাই সমাজ সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জাতির সঙ্কট মোচনের জন্যে চিন্তাভাবনা করে চলে। সে জাঁকজমকের সঙ্গে নিজের বাড়িতে বিদ্বজ্জন সম্মিলনের ব্যবস্থা করে। ওই সভায় যোগ দেয় সকল শিক্ষিত আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের গণ্যমান্যরা। 'তিন দিন ধরিয়া' 'নূর সাহেবের বাটী মোকামেই সভার কার্য্য' চলে, 'জাতির উন্নতিই সভার আলোচ্য বিষয়' হয়ে আসে আর ওই সভায় 'মোসলমানের লুপ্ত গৌরবের' উদ্ধারের পথ অন্বেষণ করা হয়। এ ভাবে নূর মোহাম্মদ প্রতিপন্ন করে তার সমাজের অন্য সকলের চেয়ে তার ভিন্নতা ও তার শ্রেষ্ঠত্ব। শুধু লোকহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী হিশেবেই জয়ধ্বনি পায় না সে, জাতির দুর্দশায় কাতর অগ্রণী চিন্তাবিদ হিশেবেও তার নামে জয়ধ্বনি ওঠে।

প্রথম পর্যায়ের এই নব্য আদমের পরে বাঙালি মুসলমান সমাজে দেখা দেয় আরেক গোত্র নতুন আদম। প্রথম গোত্রের রক্তমাংসের বাস্তব নব্য আদমের

প্রতিনিধি হিশেবে আমরা পাই এই নায়কদের, আর বাস্তব নব্য আদম থাকে নেপথ্যে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের নব্য আদম নেপথ্যে থাকতে পছন্দ করে না। সে সরাসরি নিজেকে জাহির করে; জ্ঞাপন করে নিজের উদ্দেশ্য-অভিপ্রায়-লক্ষ্য। দু'পর্যায়ের নতুন আদমই স্বল্প ইংরেজি শিক্ষিত, দুয়ের চেতনাই অবিকশিত। কিন্তু দু'ইই উচ্চাভিলাষী, আত্মম্ভরী। তবে প্রথম পর্যায়ের নতুন আদমের উচ্চাভিলাষের সীমা আছে; কিন্তু পরবর্তীরা অতি উচ্চাভিলাষী। তাদের উচ্চাভিলাষ গগনচুম্বী। তারা চায় আরো ব্যাপক সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি। বলা যায় পূর্ববর্তীদের নিজ গ্রামে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের বাসনা ও উদ্দেশ্যই পরবর্তীদের জীবনে আরেকটু ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। পূর্ববর্তীরা তাদের কর্মস্থল মফস্বল শহর থেকে ফিরে আসে গ্রামে পৈতৃক বসতভিটায়; আর ওই গ্রামীণ সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠতে পারাই তাদের স্বপ্ন। পরবর্তীরা গ্রাম বা মফস্বল শহর থেকে পাড়ি জমায় রাজধানীর দিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে চায় গোটা বাঙালি মুসলমান সমাজকে। এটি দূষণীয় কিছু নয়। বরং বাঙালি মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে এমনটি হওয়াই ছিলো অতি জরুরি।

কিন্তু পববর্তী নতুন আদম বাঙালি মুসলমান সমাজকে না পেরেছে অতি উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার দিকে অগ্রসর হবাব অনুপ্রেরণা জোগাতে, না পেরেছে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ও আধুনিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি করতে। এই গোত্রটির নিজেরই ছিলো না উচ্চশিক্ষা, ছিলো না মুক্তচেতনা, ছিলো না আধুনিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠার যোগ্যতা। এ- গোত্রের একমাত্র কামনা ছিলো অভীষ্ট ব্যবসায়ে সিদ্ধিলাভ। আর ছিলো বাগাড়ম্বর। যে- কোনো উপায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিলো এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজ ও জনগণের কল্যাণ তার মাথাব্যথার বিষয় নয়, আত্মস্বার্থ সিদ্ধিই তার লক্ষ্য। সে নিজেকে অকুতোভয়, কুসংস্কারবিরোধী, বলিষ্ঠ 'সমাজ সংস্কারক' বলে প্রচার করে; যা সে কখনোই নয়। 'সমাজ সংস্কারক' হিশেবে প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়ে নারীর দিকে। পূর্ববর্তী নতুন আদম মনে করে নারীকে নিয়ে তার আর কিছু ভাবার নেই। কেন না বহু কাঠখড় পুড়িয়ে যে লাভ করে মনমতো বশংবদ পরিচারিকা। সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের কালে ওই দয়াল প্রভু তার কথা একবারে ভুলে যায় না, ববং তার জন্যে তৈরি করে সমাজসেবার ছোটখাটো সুযোগ। তৈরি করে বালিকাদের পাঠশালা এবং ওই অপশিক্ষাকেন্দ্রে 'অনারীর সার্ভিস' দেবার সুযোগ পায় ওই পরিচারিকা। সেখানে সে পববর্তী বালিকাদেব শেখায় তার মতো আত্মবিলোপদক্ষ হয়ে ওঠার বিদ্যা। প্রভুব নামের সঙ্গে নিজের নামের জয়ধ্বনি শুনে ধন্য হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছু কবার নেই। পত্নী প্রেমে বিহবল হয়ে যে নতুন আদম এমন বিদ্যাদান কেন্দ্র

খুলে দেয় তা নয়। বিবিকেও সে ব্যবহার করে নিজের প্রতিপত্তি অর্জনের ও মর্যাদা বৃদ্ধির ঘুঁটি হিশেবে।

পরবর্তী নতুন আদম ঘোষণা করে নারীকে নিয়ে বহুকিছু করা বাকি। এবং নিজেকে অভিহিত করে নারীর মহান ত্রাতারূপে। নিজেকে নারীজাগরণের অকুতোভয় যোদ্ধা বলে প্রচার করে এবং নারীমুক্তি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে সে পূর্ববর্তী নতুন আদমেরই ভিন্ন রূপ, যে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে মাত্র। নারীর জাগবণ কী সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। নারীমুক্তির জন্যে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথাও নেই। যদিও সে জানেই না নারীমুক্তি কাকে বলে কিন্তু নারীর জন্যে আহাউহু করে উথলে ওঠে, এবং এই আহাউহু ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে, বহুজনের সামনে জাহির কবার জন্যে কোমর বেঁধে লাগে। সে এমন করে কারণ এখন তার মধ্যে সাধ জাগে নিজেকে সামাজিক মহাবীর ও পরম ভ্রাতা রূপে দেখার। পূর্ববর্তীরা গ্রহণ করে ছোটখাটো স্বল্পআয়ের পেশা, যদিও পরিণত জীবনে স্বাধীন ব্যবসা করে অর্জন করতে চায় অর্থবিত্ত। পরবর্তীরা ব্যবসা দিয়েই যাত্রা শুরু করে। তবে এ- ব্যবসা পাটের ব্যবসা নয়। এ- ব্যবসা আরো চমকপ্রদ; এবং বাঙালি মুসলমানদেব জন্যে এ-পেশা একেবারেই অভিনব। অভিনব ওই ব্যবসাটি হচ্ছে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবসা। নূর মোহাম্মদ নূরুল এসলাম-এর ছদ্মনামে পূর্ববর্তী নতুন আদম নিজেকেই উপস্থিত করেছে। পরবর্তী নতুন আদম আত্মপ্রকাশ করে নিজের নামে। পূর্ববর্তীদের মতো সেও নিজেকে নারীর কল্যাণের জন্যে কাতর বলে ঘোষণা করে, যদিও ওই কাতরতা একেবারেই বানোয়াট। এই নতুন আদমের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করা যায় মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে।

ভুল নারী জাগরণ : ভুল প্রবক্তা

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন আবির্ভূত হন পত্রিকা প্রকাশক ও সম্পাদক রূপে। তিনি তাঁর কর্মস্থল হিশেবে বেছে নেন কলকাতাকে; কেন না নব্য আদমের এ-গোত্রটি চায় রাজধানী কলকাতায় প্রতিষ্ঠা। তার আগে এই 'নতুন আদম' তাঁর পূর্ববর্তী গোত্রটির মতোই জীবনের প্রথম পর্যায়ে কাটান গ্রাম ও মফস্বল শহরে। তিনি প্রথম পর্যায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্যে অবলম্বন করেছেন নানা পেশা। স্থানীয় স্টিমার স্টেশনের সহকারী টিকিট বিক্রেতার কাজ করেছেন, বীমার দালালি করেছেন, করেছেন বই বিক্রির ব্যবসা। তবে মফস্বলের সাফল্য তাঁকে তুষ্ট করে নি; তাঁর ক্ষুধা আরো ব্যাপক। পূর্ববর্তীদের মতো তিনি 'উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিত' নন। তিনি গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে স্বল্পকাল মাত্র অধ্যয়ন করেন। অর্থাৎ তিনি কেবলই পাঠশালা উত্তীর্ণ। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ গ্রন্থের 'আত্মকথা' অংশে তিনি নিজের সম্পর্কে বহু তথ্য দেন: কিন্তু নিজের শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কে থাকেন প্রায় নিশ্চুপ। এ-আদমের শিক্ষাগত যোগ্যতা সামান্য; কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ও অভিলাষ অতি উচ্চ। বিত্তশালী ও প্রতিপত্তিশালী হবার বাসনা তার গোত্রের অন্যদের মতো তাঁকেও তাড়িয়ে ফেরে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে নানা ফন্দিফিকির করার ব্যাপারে তাঁর উদ্যম অসীম। এবং তিনি জানতেন সুযোগের সদ্ব্যবহার করার বিধিবিধানগুলো। এই নতুন আদম প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চায় পুরো বাঙালি মুসলিম সমাজে; আর প্রতিপত্তি বিস্তারের পথ সে নিজেই খুঁজে নেয়।

কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন শুরু করেন পত্রিকা প্রকাশের ব্যবসা। এ-ব্যবসাটি ওই সময়ের বাঙালি মুসলমানের জন্যে অভিনব; কিন্তু নতুন আদম বুঝতে পারে নতুন কালে নিজেকে অভিনব ও সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র বলে প্রতিষ্ঠিত করার পথ কোনটি এবং সে তার গ্রহণে দ্বিধা করে না। এই প্রকাশনা ব্যবসায় সে জড়িত হয় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু এ- কথা অকপটে বলবার মানসিকতা তার নেই। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করা খুব মহৎ ব্যাপার। আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই-এর লড়াকু মানুষই গণ্য হতে পারে

এ- সময়ের প্রকৃত বীর রূপে। কিন্তু এই নতুন আদম ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে মুড়ে দেয় বড়ো বড়ো মহৎ নিঃস্বার্থ সমাজসেবার বুলিতে। নিজেকে মহাসমাজসেবী হিশেবে দেখাতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। গোপন করে নিজের প্রকৃত রূপটি। এটিই দূষণীয়। এ- গোত্রের নতুন আদম কপট এবং নিজেকে সবসময় মহৎরূপে দেখাতে থাকে সদা তৎপর। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনও জানান অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি মুসলমান জাতির জীবনে জ্ঞান ও মুক্তির আলো জ্বেলে দেবার জন্যেই তিনি নিজেকে সঁপে দেন পত্রিকা প্রকাশের কাজে। তিনি নিজেকে জাহির করেন লড়াকু নায়ক রূপে; যে-নায়ক সগোত্রের কল্যাণ সাধন ও মুক্তির জন্যে অবিশ্রাম লড়ে চলে। তিনি নিজেকে অমন মহৎ ভূমিকায় দেখতে পছন্দ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভূমিকা এমন মহৎ ছিলো না। এ– আদম লড়াকু ঠিকই, তবে তার লড়াই-এর পুরোটাই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে। তার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাপারটিই মুখ্য, অন্য সবকিছু গৌণ। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন নিজেকে তাঁর সময়ের নারী জাগরণ আন্দোলনের প্রবক্ত এবং নির্ভীক যোদ্ধা বলে মনে করেন। তিনি দাবি করেন যে ওই সময়ের দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালি মুসলমান নারীদের জাগরণ ও মুক্তির জন্যে তিনি পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ গ্রন্থে তিনি তাঁর ওই 'অগ্রণী ভূমিকা' পালনের বিস্তাবিত বিবরণ দেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে তিনি যাকে নারী জাগরণ বলে মনে করেছেন তা প্রকৃত নারী জাগরণ নয়। আর ওই সময়ের বাঙালি মুসলমান নারীর জাগরণের জন্যেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সংস্কারক নন।

পূর্ববর্তী নতুন আদম যে নতুন বিবি তৈরি করে সংসারের সুধা পান করেছে; পরবর্তী এই নতুন আদম ওই পোষা পাখিদের বুলি সকলকে শোনাবার ব্যবস্থা করেছে মাত্র। পোষা পাখি শেখানো বুলি দাঁড়ে বসে আওড়াতেই পারে; সেটি তার মুক্তি বা উন্নতির পরিচয়বাহী নয়; সেটি তার অতিবশমানা, নিরুদ্যম, খাপ খাওয়াতে পেরে ধন্য হয়ে যাওয়া অবস্থাটিকে প্রকট করে তোলে মাত্র। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন নতুন বিবিদের স্বরচিত পদ্য ও ভাবালু দুর্বল গদ্যের অতি সমঝদার পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন এবং তাঁর পত্রিকায় নির্বিচারে ওইসব রচনা প্রকাশ করে চলেন। তিনি নারী জাগরণ বলতে বুঝেছেন অল্পশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত অন্ত ঃপুরবাসিনী নতুন বিবির সাহিত্যচর্চাকে। তিনি বিশ্বাস করেছেন এ-পথেই নারী মুক্তি সম্ভব। নারী নতুন আদমের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করে চললেই সে হয়ে উটবে মর্যাদাসম্পন্ন জাগ্রত ও মুক্ত নারী। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন অন্তঃপুরবাসিনী নতুন বিবিকেই আরেকটু নতুন রূপে গড়ে ওঠার আর একটি ছাঁচ গড়েছেন মাত্র। যাতে নতুন কালে নতুন আদমের পরবর্তী গোত্রটির পক্ষে আরো মনমতো বিবি লাভ সহজ হয়ে ওঠে। তাঁর নারী জাগরণ বিষয়ক ধারণাটি ভুল। নারী জাগরণ বলে যাকে তিনি অভিহিত করেছেন তা হচ্ছে শৃঙ্খলিত নারীর চিরবশমানা চিরসুষুপ্ত

চিরতৃপ্ত এক অসুস্থ অবস্থা মাত্র। অল্পশিক্ষিত নারীর ভাবালু পদ্য বাহবা জোটাতে পারে; কিন্তু ওই বাহবা নারীর অবস্থার বদল ঘটাতে পারে না। ভুল নারী জাগরণের ভুল প্রবক্তা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন অবরুদ্ধ নারীর সামনে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিভ্রান্তির জাল।

তিনি নিজেও ছিলেন বিভ্রান্ত এবং প্রগতিশীলতা সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণাসম্পন্ন। কারণ ওই বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিলো না। এবং অবিশ্রাম অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে নিজেকে অধিকতর পরিশীলিত করার তাগিদও তার মধ্যে ছিলো না। বরং অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের মতোই তিনিও নিজেকে স্বভাবজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে গণ্য করেছেন। ফলে তাঁর প্রকাশিত সওগাত বাঙালি মুসলমান সৃষ্টিশীল তরুণকে 'মুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টিশীল' হয়ে ওঠার বদলে 'মুসলমান লেখক' হতে প্ররোচিত করেছে শুধু। সওগাতও হয়ে ওঠে নি বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত ওই সময়ে সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কোনো পত্রিকা। সওগাত প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল ভারতবর্ষ, ভারতী, প্রবাসী, সবুজপত্র প্রভৃতি উচ্চমানসম্পন্ন পত্রিকা এবং ওই পত্রিকাগুলোতে মুদ্রিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ও উচ্চমানসম্পন্ন নানা রচনা। কিন্তু সওগাত কখনোই এমন উচ্চমানসম্পন্নতা অর্জন করে নি। এটি কখনোই বিস্মৃত হয় নি যে এটি মুসলমানের কাগজ। ওই মুসলমান বাঙলা ভাষায় কথা বলতে পারে বটে কিন্তু তার প্রধান পরিচয় সে মুসলমান। তাই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা হিশেবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দিলেও পালন করে মুসলমানের অতীত শৌর্য প্রচারের দায়িত্ব। এ-পত্রিকার নামকরণের মধ্য দিয়েও সম্পাদকের মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি সাহিত্য পত্রিকার জন্যে তিনি কোনো বাঙলা নাম জোগাড় করতে ব্যর্থ হন। ওই ব্যর্থতার জন্যে তাঁর কোনো গ্লানি নেই; এমন অভিনব আরবি নাম রাখতে পেরে অতি পুলকিত হয়ে ওঠেন তিনি।

সওগাত-এর লক্ষ্য ছিলো 'প্রথম শ্রেণীর মাসিকের আদর্শে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি দ্বারা পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা'; 'সমাজের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা'; 'পত্রিকার প্রতি পাঠক সাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যে বিবিধ বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ এবং মুসলিম জগতের সচিত্র বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা।' প্রথম দুটি ঘোষণাকে বলতে পারি চমক সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত নিরর্থক বুলি; কিন্তু তৃতীয় ঘোষণাটি জ্ঞাপন করে ওই নতুন আদমের মনোভাব ও অভিপ্রায়। তাঁর অভিপ্রায় হচ্ছে ব্যবসায় সাফল্য অর্জন এবং বাজারে পত্রিকার কাটতির জন্যে যা করা প্রয়োজন সবকিছু করতেই তিনি প্রস্তুত। এটি

নিন্দনীয় কিছু নয়। একজন পেশাদার ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ওই নতুন আদমের সমস্যা হচ্ছে তিনি নিজেকে শুধু ব্যবসায়ী হিশেবে দেখাতে সুখ বোধ করে না, বরং তিনি নিজেকে তুলে ধরতে চান সংগ্রামী সমাজকর্মী রূপে, যা আসলে তিনি কখনোই নন।

প্রথম সংখ্যা সওগাত-এ ছাপা হয় কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা ইত্যাদি বহুকিছু। লেখক এবং সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গির ও বিশ্বাসের গভীর পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে ওই রচনাগুলোতে। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন, 'মোসলেম নীতিশাস্ত্র', 'আগ্রা দুর্গ', 'মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার', 'সিসিলী দ্বীপে মুসলমানদের জ্ঞানচর্চা', 'অতীত যুগের মুসলিম রমণী' ইত্যাদি। এ- পত্রিকায় মুদ্রিত হয় অনেক রঙিন ছবি। প্রথম সংখ্যার 'মুখপাতে ছাপা হয় সারাসিন রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য (মহিলাদের ছবি)' ছাপা হয় 'শীতকালীন পোশাকে আরব রমণী' এবং 'গ্রীষ্মকালীন পোশাকে আরব রমণী'র ছবি। আগ্রাদুর্গের ছবির সাথে মুদ্রিত হয় 'দেওয়ানী আম (আভ্যন্তরীণ দৃশ্য)'- এর ছবি। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও চিত্রের বিষয়বস্তু থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ পত্রিকাটি বাঙালি মুসলমানের চেতনার মুক্তির জন্যে কোনো ভূমিকা পালন করে নি; বরং তাকে আরো কূপমণ্ডুক ও পশ্চাৎপদ করে তোলার জন্যে পালন করেছে সক্রিয় ভূমিকা।

সওগাত বাঙালি মুসলমানকে আরো বেশি করে মনে করিয়ে দিয়েছে মুসলমানদের অতীত শৌর্যের কথা; যে- শৌর্য বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব অর্জন ছিলো না; ওই শৌর্য ছিলো বহিরাগত বিভাষী মুসলমান শাসকের। তবু তাকেই আপন শৌর্য বলে গণ্য করার জন্যে সওগাত প্ররোচিত করেছে। অতীত শৌর্যের জন্যে হাহাকার ও মিথ্যে দম্ভ নিয়ে বাঙালি মুসলমান ইংরেজ শাসনামলের দেড়শো বছর তলিয়ে থেকেছে পতনের অতল অন্ধকারে। সওগাত ওই অন্ধকারে হাহাকারে মেতে ওঠার জন্যেই বাঙালি মুসলমানকে প্ররোচিত করে চলে নতুন ভাবে। আর অজ্ঞানতা কুসংস্কার থেকে বাঙালি মুসলমানকে মুক্ত করার জন্যে মুসলিম রমণীর ছবি ছাপা জরুরি ছিলো না; এটি জরুরি ছিলো পত্রিকার বিক্রি বাড়াবার জন্যে। রমণীর মুদ্রিত ছবি অধিকাংশ স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানকে যে পত্রিকা কিনতে প্ররোচিত করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক নারীকে ব্যবহার করেছেন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে; কিন্তু মুখে উচ্চারণ করেছেন নানা মহৎ বুলি। নিজেকে তিনি অভিহিত করেছেন মূর্তিভঙ্গকারী বলে :

> সওগাতের পূর্বে বাংলার মুসলিম সমাজের কোনো পত্রিকায় মানুষের ছবি নিয়ে কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রে ছাপা হয়নি। মহিলাদের ছবি ছাপা তো কল্পনারও বাইবে ছিলো। প্রথম সংখ্যা সওগাতে আমি চিরাচরিত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে পুরুষ ও নারীর ছবি ও কার্টুন ছবি ছেপেছিলাম।

তিনি বোঝেন নি যে মহিলাদের ছবি ছেপে দিলেই চেতনালোকের অনড় অন্ধকার দূর হয়ে যায় না, ছবি ছাপা মানে প্রগতিশীলতা নয়। এতে অজ্ঞ মোল্লাদের ক্ষিপ্ত করে হুলস্থুল বাঁধানো সহজ; কিন্তু প্রকৃত প্রগতিশীলতা অর্জনের পথ এটি নয়। এ-আদম এটি বোধ করেন নি কারণ তা বোধ করার মতো শিক্ষা ও মেধার কোনোটাই তাঁর ছিলো না। নিজের কীর্তির কথা স্মরণ করে পরিণত বয়সে তিনি গর্বে ও গৌরবে ভরে যান। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ (জুলাই ১৯৮৫) গ্রন্থে নিজের ভূমিকার কথা স্মরণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন :

> আমাদের সমাজের সেই কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধকার যুগে- যখন গল্প, উপন্যাস ও ছবি ছাপা ছিলো নিষিদ্ধ- সে সময় কি করে যে আধুনিক ধরনের সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প নিয়েছিলাম, তা নিজেই এখন বলতে পারি না। ...জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও এরূপ একটি পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন যে দুঃসাহসের কাজ করেছিলাম আজ তা ভাবতে গেলে আমি নিজেও কম অবাক হই না।

এ- বক্তব্য কোনো পরিণত, দৃঢ়চেতা, সংগ্রামী সমাজসংস্কারকের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে না, বরং স্পষ্ট করে তোলে হঠকারী এক মানুষের ছবি; অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে একদা যে তার অস্থিরমতি যৌবনে নানা গোলমেলে কাজ করতে পিছপা হয় নি। এখন ওই অবিমৃষ্যকারিতার কথা স্মরণ করে শিহরিত হয়ে ওঠা ছাড়া যার কোনো গত্যন্তর নেই। আর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন বাঙলা সাহিত্যে আদৌ কখনো আসে নি। সওগাত বাঙালি মুসলমানকে আধুনিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠার জন্যে কোনো উদ্দীপনা ছড়াতেই সমর্থ হয় নি। এটি একটি প্রথাগত পত্রিকা, বাঙালি মুসলমানকে কেবলই মুসলমান ভাবতে থাকার উদ্দীপনা ছড়ানো ছাড়া যা আর কিছুই করে নি। এ- পত্রিকায় সাহিত্য সৃষ্টির নামে হয়েছে চর্বিতচর্বন। মুসলমানদের অতীত গৌরবের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও গর্ববোধ করেই এ-পত্রিকার লেখকদের রচনাশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। ওই রচনাগুলোর বড়ো অংশই সাহিত্যমূল্যশূন্য এবং কুপমণ্ডুকথার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিশেবে স্মরণযোগ্য।

তবে নতুন বিবিকে নবরূপ দেয়ার কাজে সওগাত যে-ভূমিকা পালন করে তাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা স্মরণযোগ্য বিষয়। সওগাত-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই অবরোধবাসিনীদের পদ্য ছাপাবার উদ্যোগ নেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দন এবং সওগাত মহিলা সংখ্যা প্রকাশের জন্যে গভীর তাগিদ বোধ করেন। এমন নয় যে বাঙালি মুসলমান সমাজে তখন নারী শিক্ষা ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছিল। দরিদ্র পল্লীনারীর জীবন তখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত উচ্চবংশীয় অন্তঃপুরবাসিনী তখন বর্ণপরিচয় সম্পন্ন করছে গোপনে; সাধারণ মধ্যবিত্ত নারীদের

গুটিকয় মাত্র পাঠশালা উত্তীর্ণ হয়ে শোভা পাচ্ছে নতুন আদমের গৃহস্থালীতে। ওই স্বল্পশিক্ষিত নারীকে কবি ও লেখক করে তোলার উচ্চাভিলাষ তাড়িত করে ওই নতুন আদমকে। এর পেছনে কাজ করেছে নারীর ত্রাতা হিশেবে নিজেকে জাহির করবার তাগিদ এবং সহজে সিদ্ধিলাভের জন্যে তিনি বেছে নিয়েছেন এই পথ। তিনি জানান, নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির জন্যে তিনি বরণ করেছিলেন সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলদের অত্যাচার ও বিরুদ্ধতা; কিন্তু প্রকৃত প্রতিক্রিয়াশীল আসলে তিনি নিজে। রক্ষণশীল গোঁড়া নিরক্ষরেরা নারীর চিহ্নিত শত্রু; কিন্তু এই 'ইংরেজি শিক্ষার' আলোকপ্রাপ্ত নতুন আদম, যে দেখা দেয় নারীর মিত্র রূপে, সে শত্রুতা সাধন করে সুকৌশলে এবং নারীকে চিরবিকলাঙ্গ করার কাজটি তাঁর হাতেই ভালোভাবে সম্পন্ন হয়।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে সওগাত নারী জাগরণের কাজে এতোই নিবেদিত হয়েছিলো যে ওই সময় এ- পত্রিকা একটি মহাউত্তেজক শ্লোগানও তৈরি করে ফেলে। সওগাত-এর শ্লোগান ছিলো 'নারী না জাগলে জাতি জাগবে না।' স্মৃতিচারণার কালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনও নানা প্রসঙ্গে জানান, নারীর ত্রাতা হিশেবে তাঁর অসামান্য ভূমিকার কথা। তিনি বলেন :

> বাংলার মুসলিম নারীদের অধঃপতন ও দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে সওগাতের মাধ্যমে নারী জাগরণ আন্দোলন শুরু করার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজের অর্ধেক শক্তিকে পঙ্গু করে রেখে জাতি গঠন তথা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই ছিলো না।.... কোনো প্রকার ঝুঁকি না দিয়ে এরূপ কাজে অগ্রসর হওয়া যায় না, এ বিষয়ে অবগত থেকেই আমি সওগাতের মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলন পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করি।

তিনি নারী মুক্তি বলতে বুঝেছেন নারীর সাহিত্য চর্চা ও পত্রিকায় ওই সাহিত্যকর্মের প্রকাশকে। সকল বাঙালি মুসলমান নারীর সাক্ষরা হয়ে ওঠা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাঙালি মুসলমান নারীর উচ্চশিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকে তিনি নারীমুক্তি বা নারী জাগরণ বলে মনে করেন না। নারীর উচ্চশিক্ষা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, নারীর স্বাবলম্বী হবার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না; কিন্তু নারী জাগরণ নিয়ে বোধ করেন প্রবল মাথাব্যথা। তাঁর কাছে নারী জাগরণ হচ্ছে পর্দানশীন অর্ধশিক্ষিত নতুন বিবিদের কবিতা রচনায় এগিয়ে আসা। তাঁর কথায় তাঁর ওই বোধই প্রকাশিত হয় : 'আমার প্রথম কর্মসূচী ছিলো সাহিত্য সংস্কৃতি তথা সামাজিক উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণের জন্যে মেয়েদের উৎসাহিত

করা।' নারীর নিষ্ক্রিয় পরজীবী পরিচারিকা রূপটিকেই তিটি অটল ও অচল করার জন্যে আটঘাট বেঁধে নামে। সওগাত তাই 'কঠোর অবরোধ ও নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও লুকিয়ে লুকিয়ে যে কয়েকজন মহিলা বাংলা ভাষা শিখেছিলেন, তাঁদেরকে খুঁজে বের করে তাঁদের রচনা সওগাত-এ প্রকাশ' করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার পথে অগ্রসর হবার জন্যে নারীকে অনুপ্রাণিত করে না। বরং নারীর চিরঅজাগ্রত থাকার সকল আয়োজন সে সম্পন্ন করে। সওগাত ওই অর্ধশিক্ষিত নারীর নিরর্থক ভাবালুতাকে মুদ্রিত করে এবং ওই রচনার প্রশংসা করে নষ্ট করে দেয় নারীর স্বভাব। বাঙালি মুসলমান নারীকে এইভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, সে কখনোই পুরুষের তুল্য উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবে না। সে পুরুষের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন নয় এবং তা হওয়া তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তার সৃষ্টি হবে একান্তই নারীর সৃষ্টি, যাকে করুণা করে পুরুষ পাঠ করবে।

শুধু নারীদের রচনা ও ছবি নিয়ে প্রকাশিত হয় সচিত্র মহিলা সওগাত (১৯২৯)। সওগাত-এ মুদ্রিত হতো দূরদেশী মুসলিম রমণীর ছবি, আর মহিলা সওগাত-এ ছাপা হয় বঙ্গীয় মুসলিম নারীদের ছবি। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এ বিষয়টিকে ওই সময়ের নারী জাগরণের জন্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে ঘোষণা করেন। এটি তাৎর্যপূর্ণ তো বটেই, কারণ এর মধ্য দিয়ে সুসম্পূর্ণ হয় পুরুষতন্ত্রের একটি সুগভীর চক্রান্ত। নারী তুচ্ছ চটক ও সস্তা পরিচিতির আফিমের স্বাদ পায় এর মধ্য দিয়ে এবং প্রকৃত মুক্তি ও জাগরণের পথে পা বাড়াবার কষ্ট স্বীকার করতে অনীহ হয়ে পড়ে। বাঙালি মুসলমান নারীর প্রকৃত জাগরণ ও বিকাশের পথ এভাবে রুদ্ধ করে দেয়া হলো; এবং এর মধ্য দিয়ে বপন করে দেয়া হলো নারীর দুশ্চরিত্র হয়ে ওঠার বীজ। পরে আমরা দেখতে পাবো কয়েক দশকের মধ্যেই বাঙালি মুসলমান নারী নষ্ট পুরুষগুলো মতোই ব্যাপক পচনগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এবং অন্য সকল নতুন আদম বিশ্বাস করতেন এবং নারীমুক্তির ইসলামী বিধানে; এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীদের উন্নত জীবন ও উন্নত অবস্থার নানা দৃষ্টান্ত ও নানা গল্প সওগাত-এর প্রতি সংখ্যায় মুদ্রিত হতো। সওগাত-এ নারীদের বিষয়ে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলোর ছিলো এমন শিরোনাম : 'ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীর অধিকার', 'ইসলামে নারীর মূল্য', 'গৌরবের যুগে মুসলিম রমণী' ইত্যাদি। এ- সব প্রবন্ধে দেখানো হতে থাকে দূর অতীতে মুসলিম রমণী তার বাগ্মীতা, শাস্ত্রজ্ঞান, কাব্যপ্রতিভা, মরমীবাদে পারঙ্গমতা ও সুন্দর হস্তাক্ষর দিয়ে পুরুষদের অভিভূত করে কতো যশ অর্জন করে তার অতিরঞ্জিত চিত্র। আর এ- সব প্রবন্ধ দিয়ে বাঙলার মুসলিম নারীদের ওই রকম হয়ে ওঠার জন্যে প্রচারণা চালানো হতে থাকে।

নারীর কাব্যপ্রতিভা বা সুন্দর হস্তাক্ষর পুরুষকে অভিভূত করার জন্যে শুধু।

পুরুষকে অভিভূত করে যশ অর্জন করাই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের কাছে নারী জাগরণ। কারণ দূর অতীতের মুসলিম রমণীকে এভাবেই বন্দনা পেতে দেখেছিলেন, তাই তাঁর কাছে এইই নারী জাগরণ। তিনি দীক্ষিত বলেই চটক ও আড়ম্বরের নীচেকার শ্বাসরুদ্ধকরতা ও নারীকে খঞ্জ করে রাখার চক্রান্ত তাঁর কাছে এমন গৌরবের। তিনি অসত্য তথ্য দেয়ার ব্যাপারেও পরিণত বয়সে পারঙ্গমতা দেখিয়েছে। তিনি জানান এদেশের বাংলা ভাষায় মহিলা সংখ্যা প্রকাশের কৃতিত্ব একা তাঁর এবং এ- বিষয়ে তিনিই প্রথম এগিয়ে যান। তাঁর বক্তব্য এমন :

> যে দেশে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়েব কোনো সাময়িক পত্রিকাও আজ পর্যন্ত মহিলা সংখ্যা প্রকাশ কবেনি, সেখানে শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত মুসলিম সমাজের অববোধবাসিনী মহিলাদেব বচনা ও ছবি নিয়ে বিশেষ মহিলা সংখ্যা প্রকাশ করা সেই অন্ধকাব ও গোঁড়ামীব যুগে ছিলো অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ।

তাঁর এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। মহিলা সওগাত (১৯২৯) বেরোবার বহু আগে থেকেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে বাঙালি হিন্দু নারীদের নানা পত্রিকা। যেমন, বঙ্গমহিলা (১৮৭০), অনাথিনী (১৮৭৫), হিন্দু ললনা (১৮৭৮), পরিচারিকা (১৮৭৮) ইত্যাদি। তাই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের অমন সগৌরব ঘোষণা অতি হাস্যকব শব্দাড়ম্বরতা ছাড়া আর কিছু হয়ে ওঠে না। এই নতুন আদম স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ভুল নারী জাগরণের বিভ্রান্ত প্রবক্তা হিশেবে; অন্তঃপুরবাসিনী নতুন বিবিকে দিয়ে ভুল ও ফেনানো বাক্যে পদ্য লেখাতে পারাকেই যিনি নারী জাগরণ বলে মনে করেছেন।

নারীর কণ্ঠস্বর : পুরুষের ভাষা

পর্দানশীন বিবির কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো পর্দার আড়াল থেকে। সে চেয়েছে বলেই সে কথা বলেনি; সে কথা বলেছে কারণ নতুন আদম চায় সে কথা বলুক। তার পদ্যকথায় ছড়িয়ে দিক প্রভুর শিক্ষা ও বুলি। ১৯১৮ থেকেই নতুন বিবিকে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলানোর খেলায় মত্ত হয় নতুন আদম। এটি নারীমুক্তি হয়, এটি নারীকে চিরঅচেতন করে রাখার সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। নতুন আদমের ওই চক্রান্ত সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। যে অপবিশ্বাস ও ভুল ধারণা সে নারীর মগজে ঠেসে দিয়ে তাকে চিরসম্মোহিত করে রাখতে চেয়েছিলো, বাঙালি মুসলমান নারীর সে অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ অটুট আছে। ওই বিবিরা ছিলো অল্পশিক্ষিত। তাদের বর্তমান উত্তরসূরিরা আরো অনেক বেশি ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তারা এম, এ পাশ; কেবল ঘরকন্নাই তারা করে না; তারা চাকুরি করে, সামাজিক অনুষ্ঠানে যায়, নিজেরা শপিং করে এবং কেউ কেউ এমনকী ইংরেজিতে প্রবন্ধও লেখে। ওই প্রবন্ধে তারা শোনায় তাদের মগজের অনড় অন্ধকারের কথা; যে- অন্ধকার তাদের মগজে গুঁজে দিয়েছে পুরুষতন্ত্র। তারা স্বতঃসিদ্ধ বলে জানে নারী মানে হচ্ছে কখনো স্ত্রী ও গৃহিণী এবং নারীর বড়ো পরিচয় সে মা। মাতৃত্ব নারীর বড়োই বড়ো ব্যাপার, মাতৃত্বে ধন্য হওয়ার জন্যে তার জীবন। সে চাকুরি করতেও পারে; কিন্তু কখনোই সন্তানকে কষ্ট দিয়ে নয়। চাকুরি তার জন্যে তার পারফিউমের মতোই চটকদার বিষয়, সামাজিক গৌরবের জন্যে মাঝে মাঝে কাজে লাগে, তাই সে চাকুরিজীবী। সে নিজেকে কখনো মানুষ ভাবে না। নারী নিজের কাছেও কখনো মানুষ নয়, শুধু মেয়ে।

বহু আগের নতুন বিবির বোধ ও বিশ্বাস, আর এই সময়ে এম. এ. পাশ মহিলার বোধ ও বিশ্বাস অভিন্ন; এই রকম অনড় তাদের চেতনালোকের অন্ধকার। এখন বঙ্গদেশ ভরে গেছে এম. এ পাশ মহিলা নামক অজস্র ব্যাঙের ছাতায়, তাদের চেতনা অজাগ্রত, তারা বোধহীন বুদ্বুদমাত্র। এম. এ. পাশ হওয়ার চেয়ে নারীর এখন সবচেয়ে প্রয়োজন জেগে ওঠার। তার জেগে ওঠা হচ্ছে তার নিজেকে মানুষ ভাবতে পারা এবং নিজেকে স্ত্রী বা জননীরূপে চিহ্নিত করে ধন্য হয়ে যাবার নষ্ট ভাবালুতা দূর করা। সামাজিক প্রথা পালনের কারণে কেউ কারো স্ত্রী হতেই পারে।

প্রাকৃতিক নিয়মে সন্তান লাভ করতেই পারে; সেটিই নারীর পরিচয়জ্ঞাপক কোনো বিষয় হতে পারে না। স্বামী বা পিতা বলে নিজেকে জাহির করে প্রবন্ধ পুরুষ লেখে না; নারী লেখে; পুরুষপ্রভু এমন পরিচয়ে পরিচিত হতে গৌরব বোধ করে না; প্রয়োজনও বোধ করে না। নারী গৌরব বোধ করে এবং প্রয়োজন বোধ করে, কারণ পুরুষতন্ত্র তাকে দীক্ষা দিয়েছে এমন বোধ করার। সে তার নিজের মগজ ও চেতনা দিয়ে নিজের ওই 'আইডেনটিটি' তৈরি করে নি। এবং এখনও পুরুষের সমান শিক্ষা গ্রহণ করেও সে যে ওই অগৌরবজনক ভাবালুতায় উচ্ছ্বসিত হয়, তার পেছনে রয়েছে যতোটা পুরুষতান্ত্রিক চক্রান্ত, ঠিক ততোটাই আছে নারীর চরিত্রহীনতা। এই নারীরা ওই চেতনাহীন পরিচারিকা বিবিদেরই বিবর্তিত রূপ।

১৯১৮ থেকেই সওগাত-এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতে থাকে নতুন বিবিদের রচিত পদ্য। ওই পদ্যই কাজ করে নতুন বিবির কণ্ঠস্বররূপে, যেখানে বেজে ওঠে পুরুষতন্ত্রের ভাষা। এতোদিন অন্তঃপুরে তাকে পতিপ্রভু যে শিক্ষা দিয়েছে, যে ছাঁচে তাকে গড়েছে, সে এখন নিজের কণ্ঠে স্তব করে ওই ছাঁচ ও শিক্ষার। তাছাড়া এ-সময় নতুন আদম নিজেও জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পোষণ করে আরেকটু ভিন্ন ধারণা। এ-সময় তার মনে পড়ে যে দূর অতীতে ইসলামী শাসনামলে পর্দাববাসিনী নারীর কাব্য, হস্তাক্ষর, নকশাচিত্র জনসমক্ষে প্রদর্শিত হতো, আর ওই ব্যাপারটিকে পরম নারী স্বাধীনতা বলে রটনা করে ইসলামী পুরুষেরা গৌরববোধ করতেন। এখনও এই নতুন ইসলামী পুরুষেরা সে কথা স্মরণ করে অতি গৌরবে ফুলে উঠতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর নতুন আদম সহস্র বছরের পুরোনো ওই ইসলামী স্বাধীনতার আদলে নতুন বিবিকে 'স্বাধীনতা' দিয়ে নিজের মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লাগে। এটি নতুন বিবি স্বাধীনতা নয়, এখানেও নতুন আদমের অভিলাষ পুরণের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয় নতুন বিবি। প্রথমে ঘোর পর্দানশীন, গৃহস্থালির পরিপাট্য সাধনে অতিযোগ্য, সতী ও পতিনিষ্ঠ নতুন বিবিকে নতুন আদম নিয়োজিত করে পাঠশালায় বিদ্যাদানের কাজে। তবে অচিরেই বিবিকে দিয়ে এমন সমাজ সেবা করানোর রোমাঞ্চ ফিকে হয়ে আসে। তাই খুব শিগগিরই নতুন আদমের প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন কিছুর। বাঁদীকে সমাজসেবী হিশেবে দাঁড় করিয়ে আর গৌরব ও পুলকবোধ করে না প্রভু। তার গৌরব বোধ করার বিষয় ও এলাকা এখন বদলে গেছে। সে এখন নিজেকে দেখাতে চায় নারীমুক্তির অগ্রদূত হিশেবে এবং দেখতে চায় বিবির 'সৃষ্টিশীলতা'। সে বিশ্বাস করে, ইতিমধ্যে সে নিজে সৃষ্টিশীলতার পথে বহুদূরে এগিয়ে গেছে। তবে নারীর মুক্তির জন্যে নারীকে সৃষ্টিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে নি নতুন আদম। তার বিবির পদ্য তৈরির ক্ষমতা সে ব্যবহার করেছে সমাজে আর দশজনের চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার কাজে।

যেহেতু নতুন আদম বিবিকে দেখতে চায় পদ্য প্রস্তুতকারী রূপে; বিবি প্রস্তুত করে জলো ভাবালুতা মেশানো পদ্য; পুরুষের বুলিরই নারীর দেয়া রূপ হচ্ছে ওই পদ্য। বিবি বাস করে অন্তঃপুরে, গভীর পর্দার ভেতর; সেখানেই সে ওই পদ্য প্রস্তুত করে আর প্রভু তা সরবরাহ করে মূঢ় সম্পাদকের কাছে। তারপর তা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হলে দশজনকে দেখিয়ে আরো গৌরবশালী হয়ে ওঠে পতি নতুন আদম, এভাবে নতুন বিবি পদ্য প্রস্তুতকারী হয়ে ওঠে। তার চেতনা তখন অতল অন্ধকারে, বিদ্যা সামান্য; সে স্বপ্ন দেখে প্রভুর তৈরি করে দেয়া স্বপ্ন অনুসারে, প্রভু যেভাবে তার পায়ে নিবেদন করতে শিখিয়েছে ঠিক সেইভাবে নিজেকে সে নিবেদন করে। সে নিজেকে চালায় প্রভুর মর্জি অনুসারে, কেন না সে জানে পুরুষের মর্জির ওপরেই নির্ভর করে তার জীবন। যে- উপাখ্যানগুলো আমি এ- রচনার প্রারম্ভে আলোচনা করেছি, তাতে ওই বিষয়টি খুবই স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন লেখকেরা। যেমন গরীবের মেয়ে উপাখ্যানের নূরীর জীবনে দেখা যায় মধ্যরাতে নিদ্রিত ওই নারীকে ঘুম থেকে উঠে বিবাহিত হতে হয়। কারণ নূর মোহাম্মদ ওই রাতে অন্যত্র দ্বিতীয় বিয়ে করতে ব্যর্থ হয় 'অপমানের অধীর হইয়া' এমন প্রতিজ্ঞা করে যে, 'আমি অদ্য রাত্রিতে যদি... কম বয়সের শিক্ষিতা পাত্রী বিবাহ করিতে না পারি, তবে কল্য আর সমাজে মুখ দেখাইব না।' তাই মধ্যরাতেই সম্পন্ন হয় তার বিয়ের আয়োজন।

> জ্যৈষ্ঠের রাত্রি দেড় প্রহর অতীত। জনপ্রাণী ঘর্মাক্ত কলেবরে সদ্যনিদ্রার সুখদক্রোড়ে অচেতন। এই সময়ে নূরীর মা স্নেহভরে নূরীকে ডাকিয়া জাগাইলেন।... নূরীর বড় ভাবী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্নেহের পরিহাসে কহিলেন, 'এখন ঘুমের মহব্বত ছাড়িয়া একবার বাইরে আইস।... গরমে তোর গা ঘামিয়া গিয়াছে, আয় গোসল করাইয়া দেই।' এই বলিয়া নূরীকে তিনি একটি পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিলেন এবং বৈবাহিক অনুষ্ঠানে গোস করাইয়া বৈবাহিক বেশভূষায় সজ্জিত করিলেন। অনন্তর নূর মোহাম্মদ সাহেব যথারীতি পবিত্র কলেমা পাঠ করিয়া নূরীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ভালরূপে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে নূরীর অচিন্ত্য বিবাহ স্বপ্নদ্রষ্টবৎ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

জীবনের বড়ো ঘটনা বিবাহ থেকে শুরু করে রান্নাঘরের চাতালে পেঁপে গাছ বোনা পর্যন্ত সকল ব্যাপারই নির্ভর করে পুরুষের মর্জির ওপর। নতুন বিবির পদ্যেও প্রভুর এই চাহিদা অনুসারেই প্রস্তুত। যদিও এ-পদ্যগুলোকে নারী জাগরণের প্রমাণ হিশেবে তুলে ধরেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন; কিন্তু ওই পদ্যগুলো কখনোই নারী জাগরণের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হতে পারে না। আরো পরে নারীরা মহিলা সওগাতে

লিখেছেন নানা বিষয়ে গল্প ও প্রবন্ধ। গদ্য, গল্প, প্রবন্ধ- কোনো কিছুতেই নারী কখনো নিজের কথা বলে নি, কেন না সে জানেই না যে তার নিজের কোনো কথা আছে। সে কেবলই আউড়ে গেছে পুরুষের শেখানো নানা বুলি। এমননি যেমন স্বল্পশিক্ষিত নারীর রচনায় দেখা যায়, তেমনি উচ্চশিক্ষিত নারীও পালন করেছে একই ভূমিকা।

পদ্যগুলোতে নতুব বিবি বন্দনা করে নানা বিষয়ের; তবে ওই বিষয়গুলো বন্দনা করতে তার পতিপ্রভুই তাকে শিখিয়েছে। 'শিক্ষিতা পাত্রী' কে নতুন আদম সংসারে এনে দীক্ষা দেয় সকল বিষয়ে। নতুন বিবি কলকণ্ঠে বন্দনা করে ঈশ্বরের; সংসার জীবনে তার পতি তাকে বিশদভাবে জানিয়েছে ঈশ্বর বন্দনার নানা নিয়মরীতি ও ঈশ্বব বন্দনার সুফল। কখনো পদ্যে নিজেকে পতিপ্রভুর পায়ে নিঃশেষে সঁপে ধন্য হয়ে যায় নতুন বিবি। কখনো জগৎ সংসারের নানা বিষয় হয় তার পদ্যের উপাদান। এ- পদ্যগুলোর বিষয় বিভিন্ন; কিন্তু সবকটি পদ্য ধারণ করেছে একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। সবকটি পদ্য থেকে চুইয়ে পড়ে এক আত্মবিলোপধন্য বশংবদ বাঁদীর কৃতার্থ হয়ে যাবার সুর। এ- সুরও তাব নিজের নয়, এটিও তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে পুরুষতন্ত্র। নূরী, আনোয়ারা, সালেহা প্রমুখ ছিলো বাস্তব বিবি গড়ার ছাঁচ; এদের ছাঁচে যারা গড়ে উঠেছে তাদের আদি গোত্রের মধ্যে পড়ে আদি পদ্যপ্রস্তুতকারিণী নতুন বিবিরা। প্রথমবর্ষ সওগাতের বিভিন্ন সংখ্যায় এদের পদ্য ছাপিয়ে গৌরবে স্ফীত হয়ে উঠেছে এদের পতিদের এবং সম্পাদকের বক্ষ। এই বিবিদের পদ্যের প্রকাশ কোনো নবযুগেরর সূচনা সম্পন্ন করে নি, এরা পালন করে দীক্ষিত অনুচরের ভূমিকা এবং অন্যদের এমন নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দেবার জন্যে দেয় কুমন্ত্রণা। চারজন আদি পদ্য প্রস্তুতকারী বিবির রচনা এখানে উদাহরণ হিশেবে উদ্ধৃত করা যায়- যাদের প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করেছে একই ভাষা, একই বুলি।

প্রথম বর্ষ সওগাত-এর বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপা হয় বিবি আশরাফউন্নেসা, রাবিয়া খাতুন, মোসাম্মৎ মালেকা খাতুন, নূরন্নেহার খাতুন প্রমুখের পদ্য। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় রাবিয়া খাতুনের পদ্যটি। এ-পদ্যে রাবিয়া খাতুন প্রভুপুরুষের জন্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করা দেবার বাসনা জানিয়েছেন। পদ্যটির নামও 'বাসনা'। পদ্যে প্রকাশিত এই বাসনার আলোড়ন বিবিদের অস্থিমজ্জাগত করে তোলার কাজটি এর আগে সম্পন্ন করেছে নতুন আদমের একটি গোত্র, তাঁদের উপাখ্যানগুলোর মাধ্যমে। আমি আনোয়ারা উপাখ্যানটিকে উদাহরণ হিশেবে নিচ্ছি। সতী পরহেজগার আনোয়ারার জীবনের একমাত্র বাসনাই হচ্ছে প্রেমিক পতির জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করা। পতি ভালো বাসুক বা না বাসুক সে সকল অবস্থায় পতিকে ভালোবেসে যেতে চায়। রাবিয়া খাতুনের প্রথম বাসনা এমন :

ভালো মোরে নাহি বেসে
সে যদি গো সুখে রয়
বলিব না বাসিবারে
সে যে মোর প্রাণময়।
ঝরিলে নয়ন বারি
দেখে সুখী হয় যদি
আমার এ পোড়া ধারা
ঝরুক না নিরবধি,

আর আনোয়ারার হৃদয়ে জাগে এমন আকুলতা :

> প্রিয়তম, স্বামীন! অভিন্ন হৃদয় প্রাণেশ; আপনি পবিত্র প্রেমময়। আপনার প্রেমের কণিকা লাভের জন্যেও আমি ভিখারিণী। আপনি আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা, আপনার হৃদয়ে আমার স্থান নাই জানিয়াও এ শূন্য হৃদয়ে প্রিয়তম লাভের শেষ আশা পোষণ করিয়া জীবিত রহিয়াছি।

আনোয়ারা জানে সহ্য করাই তার জীবন; বাল্যকাল থেকে পুরুষতন্ত্র তাকে এ শিক্ষাই দিয়ে এসেছে এবং নিজের জীবনে সে প্রমাণ করেছে সহ্য করার ফজিলত। চরম দুঃখ ভোগের সময়ও সে থাকে প্রেমে গদগদ।

> আপনাকে ক্ষমা ? আপনার দুর্বাক্য যাহার কর্ণে মধু বর্ষণ করে, যে আপনার চরণের ভিখারিণী, তাহারা নিকট ক্ষমা?

রাবিয়া খাতুনও উচ্চারণ করেন এমনই ভাষায় মর্ষকামী হবার ফজিলত। তিনি সুখে ভরে ওঠেন : 'শতেক যন্ত্রণা তার/ শত জ্বালা নিশিদিন/ আশীর্বাদ বলে তারে/ জানি সখি চিরদিন!' বিমুখ প্রভুর পায়ে নিজেকে সঁপে দেয়াই নারীর জন্যে পরম গৌরবের/বিবি কখনই শ্রীচরণের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার কথা ভাবতে পারে না, বরং প্রভুর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ার সুযোগ আছে বলেই তার জীবনে এতো তৃপ্তি; 'সারাটি জীবন ভরি/ সাধিয়ে ধরিয়ে পায়/ লুটায়ে চরণ তলে/ যদি মোর কেটে যায়/ সেও ভাল থাক সখি/ শত অভিলাষ তার/ আমার জীবন মাঝে/ পূর্ণ হোক অনিবার'।

আনোয়ারাও একইভাবে সুখ ও তৃপ্তি বোধ করে, আর তা জ্ঞাপন করে প্রায় একই ভঙ্গিতে :

> আপনার সুখের জন্যেই আমার জীবন, আপনার সুখেই আমার সুখ।... দাসীর শেষ প্রার্থনা, আপনি বিবাহ করিয়া চিরসুখী হউন; কিন্তু দাসীকে চরণছাড়া করিবেন না। দাসী.দাসীবৃত্তি অবলম্বনে আপনার পুণ্যধামে

থাকিয়া প্রত্যহ আপনার নূরানী জামাল দর্শন করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত কবিতে পারে। আমি কলঙ্কিনী হইলেও আপনার দাসী।

পতিপ্রভুর চরণে যেমন বাঁদী নিজেকে লুটিয়ে দেবে, তেমনি সে নিজেকে লুটিয়ে দেবে অদৃশ্য স্রষ্টা প্রভুর চরণে। চরণ থেকে চরণে লুটানোই নারীর জীবন। পুরুষতন্ত্রের এই দীক্ষা বেজে ওঠে নূরন্নেহার খাতুনের পদ্যে। তার পদ্যের নাম 'তবু আমি হইব ধন্য'। ওই পদ্যের নামে বা নতুন বিবিদের যেকোনো পদ্যের নামকরণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারীর কণ্ঠস্বরের পেছনে পুরুষতন্ত্রের স্বর ও ভাষা। এ পদ্য প্রস্তুতকারিণী পতিপ্রভুর চরণে লুটিয়ে কৃতার্থ হওয়ার পঙ্‌ক্তি রচনা করে নি। সে নিজেকে লুটিয়ে দিয়েছেন ঠিকই, তবে স্রষ্টা প্রভুর পায়ে সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে :

চালাও না কেন যে পথেই প্রভু,
হব না ভুলেও বিচলিত কভু।
হক না সে পথ বিজন পাথর,
তপ্ত বালুময় মরু মাঝার,
অথবা অসীম ফেনিল সাগর-
কুজ্‌ঝটিকাময় গাঢ় আঁধার-
শুধু তব জ্যোতি ধ্রুবতারা করি,
বহিব ক্ষুদ্র এ- জীবন তরী।
বিপদের বোঝা সহিব হাসিয়া
তোমারি পুণ্য আশিষ ভরিয়া

এমনভাবে স্রষ্টার সকল দান মাথা পেতে নিতে শিখেছে আনোয়ারা ও নূরী। সুখের দিনে স্রষ্টার কাছে যেমন নিজেকে সঁপে দিয়েছে; তেমনি দিয়েছে সঙ্কটের দিনে এবং স্রষ্টা প্রভুর যেকোনো দান মাথা পেতে নিয়ে ধন্য হয়েছে তারা। পদ্যে নারীর কণ্ঠস্বরে বেজেছে পুরুষ প্রভুর সৃষ্ট দুটি সুর; আত্মবিলোপের সুখ এবং স্রষ্টার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে ধন্য বোধ করার সুখ। পদ্যের চাইতে প্রবন্ধগুলোতেই নারীর কণ্ঠস্বরে আরো তীব্রভাবে বেজেছে পুরুষের শেখানো সুর। যে- শৃঙ্খল নারীকে বন্দি করার জন্যে চাপিয়ে দিয়েছে পুরুষতন্ত্র, প্রবন্ধগুলোতে নারী কথা বলেছে ওই শৃঙ্খলের পক্ষে। জ্ঞাপন করেছে তার জীবনে ওই শৃঙ্খলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। নারীর কণ্ঠস্বরে পুরুষের কথা বলার ওখানেই শেষ নয়, এখন ওটি ঘটছে আরো উন্নত কৌশলের মধ্যে দিয়ে, আরো মনোহর ভঙ্গিতে।

পদ্যে বিবি নিজেকে সঁপে দিয়েছে চরণ থেকে চরণে, আর গদ্যে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে জয়জয়কার করেছে প্রভুর শেখানো বুলির। বিবিরা গদ্যে নারীদেরই নানা

বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে; নারীর উপর মোল্লাদের অত্যাচার, নারীদের শিক্ষা, নারীর অবস্থা, নারীর সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা, জীবনে সঙ্গীতের সুফল ইত্যাদি বহু বিষয়ে তারা মতপ্রকাশ করেছে। পত্রিকার সম্পাদক বিবিদের এই 'আধো বোল'কে নারী জাগরণ মনে করে হরষিত হয়ে উঠেছে আর বাহবা দিয়েছে। কিন্তু এটি নারী জাগরণ নয় বা বিবির এই কণ্ঠস্বর জাগ্রত নারীর কণ্ঠস্বর নয়। এটি নারীর জীবন মহাঅন্ধকারে চিরনিমজ্জিত রাখার পুরুষতান্ত্রিক চক্রান্তের একটি সফল রূপ। মতপ্রকাশ যারা করেছে তারা দীক্ষাপ্রাপ্ত চর, তারা নারী ঠিকই কিন্তু নারীর মিত্র নয়। তারা যে মত প্রকাশ করেছে তা নিজেদের বোধ উপলব্ধিজাত নয়। তারা মত প্রকাশ করেছে প্রভুর ইচ্ছে অনুসারে। এখন প্রভু চাইছে বলেই প্রভু তাকে তার সম্পর্কে যা শিখিয়েছে, সে তা- ই সকলকে শোনানো শুরু করেছে। সে নিজের প্রভুর শেখানো কথা ও প্রভুর দেয়া শিক্ষাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে বিশ্বাস করে, আর ওই বিশ্বাসের কথা গদ্যে শোনাত থাকে চরাচরকে। এতো ভালোভাবে তার মগজ ধোলাই সম্পন্ন হয়েছে যে, তার ভেতর কোনো দ্বন্দ্ব নেই, জিজ্ঞাসা নেই, খতিয়ে দেখার প্রবণতা নেই। সবকিছু ঐশী বাণীর মতো ধ্রুব তার কাছে। আর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে প্রভু তাকে যে শিক্ষা দিয়েছে তা তার কাছে ঈশ্বরের বিধানের মতো চির অপরিবর্তনীয় এবং সত্য। যে বন্দনা করে ওই বিধি ও শিক্ষার।

সে তার কণ্ঠে উচ্চারণ করে পুরুষেব বুলি; কিন্তু তার নিজের বিশ্বাস এটি তার নিজের বোধ ও উপলব্ধি। ওই শিক্ষা এমনই অস্থিমজ্জাগত হয়ে উঠেছে এখন তার জীবনে। তাই তাকে নিয়ে পুরুষ প্রভুর আর শঙ্কা নেই। কারণ তার উদ্দেশ্য চমৎকারভাবে সিদ্ধ হয়েছে। সে নিষ্কণ্টক করেছে তার গোত্রের আধিপত্য অব্যাহত রাখার পথ। বাঙালি মুসলমান নারীর মগজের অন্ধকার চিরস্থায়ী করার সকল ব্যবস্থা সে সম্পন্ন করেছে নিজের উত্থানের কালেই। যেহেতু সে জানে তার পথ নিষ্কণ্টক, তাই এখন তার নারীর কল্যাণের জন্যে নয়, নিজের মহত্ত্ব জাহিরের জন্যে। এখন বিশ্ব ভরে গেছে নারীর কল্যাণকামীতে। নারী নিজে সেমিনার করছে, নারীমুক্তি বিষয়ক প্রবন্ধ পড়ছে, যখন তখন উড়াল দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সমাবেশে অংশ নেয়ার জন্যে- চেতনাহীন, মূঢ়, প্রকৃত নারীমুক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, সুবেশী, সুবিধাবাদী নারীপুতুল; যার সুতো নেপথ্যের ধুরন্ধর প্রভুর হাতে। এদেরই পূর্বরূপ হচ্ছে ওই গদ্য প্রস্তুতকারিণী বিবিরা। এদের মতোই তারাও নারী ব্যবসায়ী আর নারীর জন্যে সমান ক্ষতিকর। এদের মতো তারাও চেতনাহীন; পুরুষতন্ত্রের দীক্ষিত অনুচর।

গদ্য প্রস্তুতকারিণী বিবিরা পর্দায় গভীর বিশ্বাস করে; কিন্তু অবরোধ প্রথার প্রতি প্রবল ঘৃণা পোষণ করে। এখন তার প্রভুর বিশ্বাস এমন বলেই সেও এমন করে। ওই সময় তার প্রভুর মগজের এতোদূর মুক্তিই ঘটেছিলো। প্রভু তখন পর্দা

বজায় রেখে অন্ধকার অন্তঃপুর থেকে বেরোবার প্রাচীন ইসলামী দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলো। ওই বিবি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলে আর কথা বলে নারী শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে। ইতিপূর্বে পুরুষ স্বকণ্ঠে যা বলেছে এখন সে পালন করে ওই ভাষণ পুনরাবৃত্তির দায়িত্ব। নিজের স্বাধীনতা ও মুক্তি সম্পর্কে বড়ো কথা বলছে সে, জানাচ্ছে অন্তঃপুর সম্পর্কে তার মনোভাব। যার কোনোটিই তার নিজের নয়। যা তার ভেতর গুঁজে দেয়া হয়েছে, সে বিরামহীনভাবে উদগীরণ করছে শুধু তাই; এবং এখনও করে চলছে। এমন কী নারীর সাহিত্য সাধনা সম্পর্কেও সে কথা বলেছে, সে কথা তার প্রভু আগে নিজে উচ্চারণ করে গেছে। মহিলা সওগাত (১৯২৯)- এ পাওয়া যায় নানা ধরনের বিবিদের নানা ধরনের গদ্য। ওই বিবিদের বড় অংশ অল্পশিক্ষিত গৃহবধূ, ক্ষুদ্র অংশ উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিত। ওই সময়ের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান নারী ফজিলাতুন নেসা লিখেছেন 'মুসলমি নারীর মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ। এ- প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায় অজ্ঞানতা ও অচেতনতায় তিনি অল্পশিক্ষিত বিবিদেরই সহোদরা। তখন কিংবা এখন কিংবা কখনোই নারীর এম. এ. পাশ হয়ে ওঠাই তার মানুষ হয়ে ওঠা নয়। ফজিলাতুন নেসা এম. এ. পাশ কিন্তু ওই ডিগ্রি তার অন্ধকার চেতনাকে আলোকিত করে নি। তাঁর এম. এ. ডিগ্রি সামাজিকগণকে চমকিত করার একটি উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

তাঁর চেতনা অজাগ্রত; তিনি জানেন না নারী শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা; কিন্তু প্রবন্ধে তিনি আউড়ে গেছেন পুরুষতন্ত্রের শেখানো বুলি। এখনকার এম. এ. পাশ বুদ্বুদেরা যা করে চলেছে, তাদের বিরল পূর্বসূরি ঠিক তাই করেছে। নিজের কণ্ঠে পুরুষের বুলি বাঙালি মুসলমান বিবিই ধারণ করেছে এমন নয়; এটি সকল পুরুষতন্ত্রই তাদের ছাঁচে প্রস্তুরত নারীদের দিয়ে করিয়েছে। বাঙালি হিন্দু পুরুষ প্রভুও তাদের ছাঁচে প্রস্তুত 'উন্নতজাতের স্ত্রী' দের এ-কাজে লাগিয়েছে আরো এক শতাব্দী আগে। ওই নারী কণ্ঠ প্রভুর বুলি আওড়াতে গিয়ে পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। প্রভুর বুলি সে আউড়ে গেছে অতি নিখুঁতভাবে। এখানে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়। এপ্রিল ১৮৭০- এ খিদিরপুর থেকে প্রকাশিত হয় মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র বঙ্গমহিলা। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এ-পত্রিকাটিতে ওই সময়ের বাঙালি হিন্দু নারী অতি নিখুঁতভাবে আউড়ে গেছে শেখা বুলি। পুরুষ প্রভু তাকে নিজের ছাঁচে প্রস্তুত করেই শুধু নিশ্চিন্ত হয় নি, বরং নানারূপে সে তাকে প্রহরা দিয়ে চলেছে, হুকুমজারি করেছে তার ওপর; যাতে নারী একরত্তি পথভ্রষ্ট না হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গমহিলা কে পথভ্রষ্ট না হবার জন্যে হুঁশিয়ারী সংকেত দিয়েছে এবং নারীর চিরঅভিবাবকের দায়িত্ব পালন করেছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পত্রিকা লেখে :

> আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকথা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

বঙ্গমহিলা তার প্রভু নির্দেশ পালন করেছে অতি বিশ্বস্তভাবে। সে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে শেখানো বুলি। সে নিজেই হয়ে উঠেছে নারী মুক্তির বড়ো অন্তরায়। প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত 'স্বাধীনতা' প্রবন্ধটিতে বঙ্গমহিলার কণ্ঠ থেকে এমন 'বাণী' ছড়িয়ে পড়ে :

> প্রকৃত স্বাধীনতা কি ? বোধকরি এ কথা নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে বোঝেন না, তাহারা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান কবা উচিত বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে এ দেশীয় কতগুলিন লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ মহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্ত্রী জাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোক মনে করিলেই যে ঘোড়া চড়িয়া উড়িয়া যায়, ইচ্ছামতে পরপুরুষের সহিত হাস্যকৌতুক অথবা নৃত্যাদি করে, লজ্জাহীনার ন্যায় পুরুষদের সঙ্গে গান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরিয়া যথাতথা বেড়াইয়া বেড়ায়, এমন স্ত্রীলোকদিগকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহস কুলায় না। নম্রতা এবং লজ্জাশীলতাই স্ত্রীলোকদের প্রধান গুণ। যে সকল স্ত্রী লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক নম্রতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরবেশে দেশ- বিদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে তাহারা কি স্ত্রী না বীর ? নারী জাতির এই সকল কার্য কি ভদ্রোচিত ? না সভ্যোচিত? না তা স্বাধীনতার ফল?... এরূপ স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গ মহিলাদের কাজ নাই। তাঁহাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনা। কে বলে যে বঙ্গ মহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ আছে ? তাঁহারা কি আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম-কর্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না ? আত্মীয়-স্বজনের বাটিতে কি গমনাগমন করিতে পারেন না ? তাহাদের মন কি স্বাধীন নহে?

এখানে নিজের জন্যে ঘুমপাড়ানি গান গেয়েছে নারী নিজে, আর এ- গান গাওয়াব জন্যে তাকে প্রস্তুত করেছে তার পুরুষপ্রভু। এটি বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রভুর ধ্বনিরই অতিবিশ্বস্ত প্রতিধ্বনি করেছে তার পরিচারিকা। প্রভু যেখানে রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী, তার নারী কথা বলে ওই সুরে; প্রভু যেখানে নিজেকে জাহির করে প্রগতিপন্থী বলে, পরিচারিকা প্রতিধ্বনিত করে প্রভুর ওই স্বর। নতুন আদম নিজেকে জাহির করেছে প্রগতিপন্থী বলে, নতুন বিবির কণ্ঠ উগরে দেয় প্রভুর ওই 'প্রগতিশীলতা' কে। নতুন আদম নিজেকে প্রগতিপন্থী বলে মনে করে। যেহেতু সে নারীর বোরকা পরে বাইরে যাওয়া অনুমোদন করে, বিবির পদ্য ছাপতে দিতে তার আপত্তি হয় না এবং সংসারের সুখের জন্যে নারীর অল্পস্বল্প শিক্ষা গ্রহণ দরকার বলে সে মত প্রকাশ করতে পারে, তাই নিজেকে চরম প্রগতিপন্থী বলে বিশ্বাস করতে এবং দাবি করতে থাকে সে। এমন দাবিদার সংসারের প্রতিপ্রভু থেকে শুরু করে মুনাফালোভী সম্পাদকের সকলেই।

প্রথম মহিলা সওগাত-এর উল্লেখযোগ্য প্রতিধ্বনিকারিণীগণ হচ্ছে ফজিলাতুন নেসা, সৈয়দা জয়নব খাতুন, নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, আয়েশা আহমদ, বদরুন্নেসা খাতুন, ফিরোজা বেগম, মিসেস এম রহমান, রহিমুন্নেসা খানম প্রমুখ। এঁদের বড়ো অংশ মুখর হয়েছেন নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যায়। ফজিলাতুন নেসা লিখেছেন 'মুসলিম নারীর মুক্তি'; আয়েশা আহমদ- এর প্রবন্ধের শিরোনাম 'মুসলিম সমাজের উন্নতির অন্তরায়'; বদরুন্নেসা খাতুন-এর প্রবন্ধের নাম 'স্ত্রী শিক্ষা' এবং 'আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' লিখেছেন ফিরোজা বেগম। এ-প্রবন্ধগুলোর বক্তব্য অভিন্ন, দাবি অভিন্ন এবং বিশ্বাস অভিন্ন। প্রতিধ্বনিরা ধ্বনিত কবেন নারী শিক্ষা সম্পর্কে প্রভুর তৈরি বিধানের। প্রভু যে অপধারণা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ওই ধারণার মহিমা ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। পুরুষ শিখিয়েছে নারীর শিক্ষা দরকার পুরুষের জন্যে। নিরক্ষরা নারী পুরুষের সংসারকে নরকে পরিণত করে; সে বাধ্য বাঁদী হতে চায় না, হতে চায় না একই সঙ্গে বহু ভূমিকা পালনকারী পরিচারিকা। যেমন হতে চায় নি আনোয়ারার গোলাপজান কিংবা নূরুল এসলামের বিমাতা কিংবা গরীবের মেয়ের তহুরা খাতুন। ফলে প্রভুর জীবন ও সংসার বিশৃঙ্খলায় ভরে যায়। ওই বিশৃঙ্খলা দূর করে লেখাপড়া জানা বিবি। কেমন করে তারা তা দূর করে তার অতিবিশদ বিবরণ হচ্ছে ওই উপাখ্যানগুলো। নিরক্ষরা তহুরা খাতুন 'অসার' ও আলস্য পরায়না', তাই নূর মোহাম্মদের 'ঘর দ্বারে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা, গৃহের আসবাবপত্রের বিশৃঙ্খলা, সর্বোপরি ছেলেমেয়েগুলির নোংরা অবস্থা' চির বিরাজমান। 'মেয়েটির হাতে মুখে, গালে ভাত তরকারী এঁটো শুকাইয়া চড়চড়' করে, ছেলেটি সর্বদা 'ধুলাবালি গায়ে মাখিয়া পল্লীর ইতর লোকের ছেলেমেয়েদের সহিত খেলিয়া বেড়ায়'। আর–

> তহুরা ও বাড়ীর চাকরানির বস্ত্রে কোন প্রভেদ নাই, বাহির বাড়িও ধুলা আবর্জনায় পরিপূর্ণ, যেন কতকাল ঝাঁট দেওয়া হয় নাই। অন্দর মহলও তদ্রূপ। ঘরের ডোয়াগুলি নিকান অভাবে স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া গিয়াছে, মেঝেগুলির মাটি স্থানে স্থানে ঘুগরা পোকা আলগা করিয়া দিয়াছে। পাকের আঙ্গিনা সাক্ষাৎ দোজখখানা। কোন স্থানে মাছ কুটিয়া আঁশগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, কোন স্থানে তরকারী কাটিয়া তাহার পরিত্যক্ত অংশগুলি স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। গোসলখানার নর্দ্দমায় নানাবিধ ওচলা পড়িয়া পচিয়া গন্ধ বাহির হইয়াছে। শয়ন ঘরের বাক্স, ডেক্স, আলমারী, আলনা, বালিশ, তোষক, লেপ, কাঁথা ও অব্যবহার্য কাপড় চোপড় ইত্যাদি নানা স্থানে বিশৃঙ্খভাবে ইতস্তত স্থাপিত আছে। চালের ধুলা কুড়া ঘুনে ঐ সমস্ত জিনিস সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। পুরানা বালিশের তুলা বাহির হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

এ-সব প্রভুকে 'মর্মান্তিক দুঃখ' দেয়। সে উপলব্ধি করে 'শিক্ষার দোষে আমাদের দেশের মেয়েরা এই 'অল্প শ্রম স্বাদ, শৃঙ্খলা সৌন্দর্যের স্বাদ উপভোগ' করতে জানে না তাই নারীর শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। তবেই সে 'গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা পরিপাট্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে মন বসাইতে' সমর্থ হবে। আবার 'পারিবারিক ধর্মভাব ও প্রীতি পবিত্রতা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক সংগে পাইবার আশা' 'দুরাশামাত্র।' 'পারিবারিক স্বর্গীয় প্রীতি পবিত্রতা' যাতে 'স্বামীগণ' পেতে পারে, সেজন্যেও নারীশিক্ষা অতি জরুরি বলে জানান আনোয়ারার লেখক।

এই একই বিশ্বাস ব্যক্ত করতে থাকেন প্রবীণ ও গৌণ সকল লেখক। গৃহে ব্যক্তিগতভাবে দীক্ষা দিয়েই তাঁরা তুষ্ট হন না, সামাজিকভাবে ওই ভূমিকা পালনের জন্যেও হয়ে ওঠেন তৎপর। ওই ভূমিকা পালনে অক্লান্ত থাকেন যেমন সাধারণ লেখককুল, তেমনি অতি উৎসাহী হয়ে ওঠেন মুসলমান খান বাহাদুরেরাও। এরা সকলেই পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন নারীর ভূমিকা বিষয়ক পুরুষতন্ত্রের তৈরি ধারণা ও বিধির। আমি এখানে একজন অতি গৌণ লেখকের রচনা থেকে ওই উদ্ধৃত করছি। খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদ, এম. এ. বি. এলও নারীর ভূমিকা নির্দেশ না করে পারেন নি। 'ইসলাম ও মুসলমান' (সওগাত, চৈত্র ১৩৩৬) প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য এমন :

> মেয়েদের শিক্ষার দরকার কেন? তাদের গৃহিণী ও মাতা এ দুটি ত নিশ্চয়ই হতে হবে। শিক্ষার অভাবে তারা বর্তমান জগতের প্রয়োজনানুযায়ী সুগৃহিণী হতে পারছেন না; সু জননী ত নয়ই। শিক্ষা না পাওয়ায় তাদের মনে প্রশস্ততা জন্মাতে পারে না; এমন কি স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ যে জ্ঞান সকলের থাকা দরকার তাও তাদের হয় না।

> সে কাবণে কি গৃহস্থালী কি সন্তান পালন কোনটাই তাবা সুচারুরূপে সম্পন্ন কবতে পাবে না। এই গেল সাধাবণ গৃহস্থালী কাজেব জন্যে শিক্ষার আবশ্যকতা। বৃহত্তব জাতীয় জীবনে যোগ দেওয়া জন্যে তাদেব উচ্চশিক্ষা পেতে হবে। স্বামীব সহধর্ম্মিনী, সহকর্ম্মিনী হবার জন্যে স্বামীর উপযুক্ত তাকে হতে হবে। শিক্ষিত স্বামীব স্ত্রী মূর্খ হলে সংসার সুখেব হতে পাবে না। মূর্খ স্ত্রী শিক্ষিতেব কিরূপভাবে সহকর্ম্মিনী হতে পারে?

প্রবন্ধে নীরস গদ্যে আর উপাখ্যানগুলোতে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে অতি রসালো গল্পের মধ্যদিয়ে যে- কথা বরা হয়েছে, প্রতিধ্বনিকারিণীগণ তাই ব্যক্ত করেছেন ফাঁপানো বাক্যে। তাঁদের গদ্য ধারণ করে আছে তাঁদের তুষ্ট ও আপ্লুত সত্তার পরিচয়। নারীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা নিঃসন্দেহ। নারী শুধু স্ত্রী, গৃহিণী, জননী। আয়েশা আহমদ জানান নারীর শিক্ষা দরকার এ- কারণে যে,

> শিক্ষিতা গৃহিণী, শিক্ষিতা জননী যেমন গৃহের শ্রীবর্দ্ধন করিবেন, পরিজনগণের কল্যাণবিধান করিবেন, জননীরূপে সন্তানের জীবন গঠনের সহায়তা করিবেন। তেমনই তাহার বহুমুখী কার্যকুশলতা দ্বারা নিজ সমাজেব মঙ্গলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিবেন।

'সমাজের মঙ্গল' বলতে তিনি কি বুঝেছেন তা অবশ্য প্রবন্ধে তিনি নির্দেশ করেন নি। কারণ তিনি নিজেও জানেন না 'সমাজের মঙ্গল' আসলে কি জিনিস, কিন্তু যেহেতু প্রভুর মুখে শুনেছেন এমন বুড়ো বুলি, তিনি তার অনুকরণ করেই ধন্য হয়েছেন। তিনি সমাজের মঙ্গল বিষয়ে খোলামেলা কথা না বললেও এ- কথা সহজেই বুঝতে পারি যে চরকা কাটা কিংবা বালিকা বিদ্যালয়ে 'অনারারী সার্ভিস' দেয়াকেই তিনি সমাজের মঙ্গল সাধনের পথ বলে জানেন। কারণ, তাঁর প্রভুও ওই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। বদরুন্নেসা খাতুনও একই সুরে আক্ষেপ করেন :

> স্ত্রী শিক্ষাব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দুর্ভাগা সমাজ সজাগ হতে পারছে না। এই শিক্ষা যে মেয়েদেরকে তথা সমাজকে কতখানি উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা তারা ভেবে দেখছেন না। অশিক্ষিতা নারী গৃহে যে কতখানি অশান্তি আনয়ন করে এবং শিক্ষিতাদের দ্বারা সংসার যে কতটা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলে, তা বলাই বাহুল্য।

তিনি বাহুল্য কথমে যাবার দরকার দেখেন নি কারণ তাঁর আগেই প্রভু আদম ওই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ-প্রতিধ্বনিকারিণী তাই মূল কথার প্রতিধ্বনি করেই কৃতার্থ বোধ করেছেন। ফিরোজা বেগমও ওই মূল কথারই প্রতিধ্বনি রচনায় আগ্রহী। তিনি নারীপক্ষ সমর্থন করে বলেন :

> বাঙ্গলার মুসলমান নারীদের শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রতিবন্ধক মোল্লা সমাজ। শিক্ষার আলোক পাইলে নারীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে, পতিভক্তি কমিয়া যাইবে- মোল্লাদের এ সমস্ত আশংকা অমূলক। তাঁহারা এ কথা ভাবিয়া দেখেন না যে নারীজাতিকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইলে তাঁহারা শুধু উপযুক্ত গৃহিণী বা উপযুক্ত মাতা হইয়া উঠে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বামীর উপযুক্ত পরামর্শদাত্রী ও সত্যকার সহধর্ম্মিনী হইয়া উঠে।

ফিরোজা বেগম শুধু গৃহিণী বা মাতৃরূপেই গৌরববোধ করে তৃপ্ত নন, 'সত্যিকার সহধর্ম্মিনী' হবার বাসনাও তার আছে। ওই সময়ে নব্য আদমের একগোত্র স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলো এ কারণে যে, লেখাপড়া জানা পরিচারিকাকে দিয়ে অফিসের পি- এর ছোটখাটো কিছু কাজও করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। যেমন বেগম রোকেয়া প্রায়শই সন্ধ্যার পরে অফিসফেরতা স্বামীর পি- এর কাজটিও হাসিমুখে সম্পন্ন করতেন, তাই সাখাওয়াত হোসেনও স্ত্রী শিক্ষার বড়োই পক্ষপাতী ছিলেন। এই প্রতিধ্বনিগণ নারীর শিক্ষা পক্ষে মুখর হয়েছে, তবে নারী কোন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তাঁদের পুরুষ প্রভুরা যে অন্তঃসারশূন্য বড়ো বুলি অবিরাম উগড়ে চলেছে, তাঁরা ঠিকঠাক তাই প্রতিধ্বনিত করেছেন। এই প্রতিধ্বনিগণ আদর্শ জননী ও গৃহিণী হবার জন্যে নারী শিক্ষার প্রয়োজন বলেই শুধু ক্ষান্ত হন না; নারীর 'মনুষ্যত্ব' 'ব্যক্তিত্ব' বিষয়ক বড়ো ব্যাপারগুলোও তাঁদের মাথাব্যথার বিষয় হয়ে ওঠে। প্রভুরা যেহেতু ওই সময় এসব ফাঁকা বড়ো বুলি বলতে ভালোবাসছিলো, দাঁড়ের পাখিও তা প্রসন্ন মনে মুখস্থ করে নিয়েছিলো।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন প্রথম মহিলা সওগাত-এর ভূমিকায় নারীর জন্যে কাতর হয়ে এমন সম্পাদকীয় লেখেন; 'নারী তাহার মনুষ্যত্বের আস্বাদ লাভ করুক- আমরা ইহাই চাই।' আয়েশা আহমদ নকল করেন ওই কথাটিই; 'নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্য– তাহার স্বাভাবিক কোমলতা ও পবিত্রতা অক্ষত রাখিয়া নারীত্বের, ব্যক্তিত্বের, মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করা।' এ বিবি যদিও বলেছে 'মনুষ্যত্বের' বিকাশ সাধনের কথা, কিন্তু তার প্রখর নজর নারীর 'পবিত্রতার'র দিকে। সতীত্ব না থাকলে নারীর কিছুই যে থাকে না। ওই প্রভু এবং বাঁদীকুল মনুষ্যত্ব সম্পর্কে পোষণ করে ভারী হাস্যকর ধারণা। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন নারীকে 'মনুষ্যত্বের' আস্বাদ দিতে চান, তবে নারীর 'মনুষ্যত্ব' বলতে তিনি বোঝেন 'সতীত্ব' 'মাতৃত্ব' প্রভৃতি ব্যাপার। তিনি বলেন, 'তাহার সতীত্ব, মাতৃত্ব সকল কিছুই মনুষ্যত্বের বিভিন্ন ভঙ্গিমা মাত্র।' নারীকে চিরবিভ্রান্ত রাখার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে নারীর মনুষ্যত্ব সম্পর্কে এমন বিভ্রান্তিকর ধারণা। আর তা বাঙালি মুসলমান

নারীর অস্থিমজ্জায় সুকৌশলে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই বোধ এখনো প্রবল প্রতাপে বাঙালি মুসলমান নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

নারীকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার জন্যে চমৎকার ভূমিকা পালন করেন ওই সময়ের এম. এ. পাশ ফজিলাতুন নেসা। 'মুসলিম নারীর মুক্তি' প্রবন্ধে নারীর শিক্ষা সম্পর্কে তিনিও দেন নব্য পুরুষতান্ত্রিক ফতোয়া :

> শিক্ষা বলতে কেবল কয়েকটি ডিগ্রীর ছাপ নয়- যে শিক্ষা মনকে উন্নত ও প্রশস্ত করে বিবেক বুদ্ধিকে সুমার্জিত ও সুচালিত করে সেই শিক্ষা। যে শিক্ষা ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান বজায় রাখার উপযোগী শক্তি দেয় সেই শিক্ষা।

যার নিজের কোনো নিজস্ব জীবনই নেই, তার 'ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান' বিষয়ক বিধি নিয়ে মেতে ওঠার মতো হাস্যকর ও করুণ আর কী হতে পারে!

প্রতিধ্বনিগণ নারীর শিক্ষা নিয়ে বড়ো বড়ো তত্ত্বকথা কপচিয়ে নিজেদের 'উৎকৃষ্ট' বলে প্রতিপন্ন করেছেন; কিন্তু এসবই হচ্ছে নিরর্থক বুলি মাত্র। যা তাদের সুকৌশলে শেখানো হয়েছে, তারা তা-ই অতি নিখুঁতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন। নারীর কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা এঁদের মাথাব্যথার বিষয় নয়। ফজিলাতুন নেসাও নিজে উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নারীর কর্মজীবনকে গোনার বিষয় বলে গণ্য করে নি। গণ্য করেন নি কারণ তাঁর বা তাঁদের চেতনা ওই জাগ্রত অবস্থা অর্জন করেন নি। ওই জেগে ওঠা নারীর পক্ষে যাতে কখনোই সম্ভব না হয় প্রভুরা তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন করেছে। তাই এম. এ. ডিগ্রি তাঁর জন্যে একটি বড়ো রকমের বাড়তি গর্বের বিষয় মাত্র; আর কিছু নয়। এখনকার এম. এ. পাশদের সঙ্গে তাই তার কোনো ভিন্নতা নেই। তিনিও পরে চাকুরি করেছেন। স্বাবলম্বী মানুষের জীবিকার প্রয়োজনে ওই চাকুরি তিনি গ্রহণ করেন এমন নয়। চাকুরি একটি বাড়তি গৌরবের বিষয় ছাড়া কিছু নয় এই বিবিকুলের কাছে। ওই গৌরববোধটিও তার মধ্যে প্রভুই ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই বাঙালি মুসলমান নারী পুরুষপ্রভুর ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়; তখনও, এখনও।

স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভারা

১. রোকেয়া

রোকেয়া এখন প্রসিদ্ধ বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের অগ্রদূত হিশেবে। তাঁকে বলা হয় বাঙালি মুসলমান নারীর জীবনের আলোর দিশারী। এ ছাড়াও পুরুষতন্ত্র তাঁর জন্যে তৈরি করেছে নানা বিশেষণ। এ সমস্ত কিছুর নিচেই ঢাকা পড়ে গেছে প্রকৃত রোকেয়া আর তাঁর জীবনের প্রকৃত রূপ। রোকেয়াকে নিয়ে এখন পুরুষতন্ত্র নানাভাবে ফেনিয়ে উঠছে। তাঁকে নিয়ে রচিত হচ্ছে নানা গ্রন্থ, হচ্ছে সেমিনার আর টিভি প্রোগ্রাম, লেখা হচ্ছে প্রবন্ধ। যদিও সমালোচকদের বড়ো অংশই ব্যর্থ হয়েছেন, রোকেয়ার মহিমা উদঘাটনে; কিন্তু তাঁরা আবেদনহীন নীরক্ত বাক্যাবলী রচনা করে চলায় বিরামহীন। রোকেয়ার মহিমা উদঘাটনের মেধা যেমন তাঁদের নেই, তেমনি তাঁদের জানা নেই রোকেয়ার স্বরূপ নির্দেশের প্রকৃত পথ। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া রোকেয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। সে কারণেই রোকেয়াকে নিয়ে নানা আকারের গ্রন্থ রচিত হলেও কোনো গ্রন্থেই রোকেয়ার ওপর প্রকৃত আলোকপাত করার কাজটি সম্পন্ন হয় না, তবে নানা রকম বড়ো বড়ো নিরর্থক বুলি এসব গ্রন্থকার অঢেল রচনা করেন।

এমন একটি রোকেয়া বিষয়ক গ্রন্থ বেগম রোকেয়া। আবদুল মান্নান সৈয়দ রোকেয়ার মূল্যায়ন করতে এসে 'শেকড় সন্ধানে'র রোমাঞ্চ বোধ করেছেন প্রবলভাবে এবং প্রবলভাবেই ব্যর্থ হয়েছেন রোকেয়ার স্বরূপ উদঘাটনে আর তাঁর ভূমিকা ও অবস্থা নির্দেশে। ভাবালুতায় ভেসে যাওয়া ছাড়াও তিনি এ-গ্রন্থে রোকেয়া বিষয়ক বিভিন্ন লেখার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করতে ভুল করেন নি; আর প্রবলভাবে জ্ঞাপন করেছেন নারী বিষয়ক পুরুষতান্ত্রিক নানা অপবিশ্বাস; যে অপবিশ্বাস নারীর জন্যে অসম্মানজনক ও ক্ষতিকর তার মহিমা জ্ঞাপনে এ- লেখক বদ্ধপরিকর। রোকেয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি জানিয়ে দেন তাঁর নিজের ভেতরে অন্ধকারের কথা। লোলচর্ম গোঁড়া মূঢ় পুরুষতন্ত্র তাঁর কণ্ঠে এ-ভাবে কথা বলে ওঠে :

> বেগম রোকেয়া শুধু নারী নন- মানুষ। কাজেই তিনি যতোখানি নারীমর্মরিত ততটাই পৌরুষেয়। যে যুগে তিনি বাস করেছিলেন তার প্রধান নায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মধ্যে গুঞ্জরিত

> হয়েছিলো নারীত্ব : ইশাবা, অর্ধাবগুণ্ঠন, ছায়াছন্নতা, কোমলতা, আধ্যাত্মিকতা, সৃষ্টিশীলতা। আর রোকেয়াব মধ্যে আমরা দেখি এক পুরুষসত্তাব প্রকাশ : বাস্তবতা, ব্যঙ্গকুশলতা, নির্দিষ্টতা, যুক্তিশীলতা, ভাবুকতা।

উদ্ধৃতিটির লেখক একজন পুংগর্বী পুরুষ। আবদুল মান্নান সৈয়দ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেকার নারীসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশ করতে পেরে পুলকে শিহরিত হয়ে উঠতে পারেন আর রোকেয়ার মধ্যে এক মহা পুরুষসত্তা আবিষ্কারের উত্তেজনায় মহারোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেও, নারী ও পুরুষসত্তার যে বৈশিষ্ট্য তিনি নির্দেশ করেন তা অতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পুরুষতান্ত্রিক হীনতায় পরিপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। নারীসত্তার ওই বৈশিষ্ট্যগুলো নারী জন্মসূত্রে নিয়ে আসে নি, এগুলোকে নারীত্বের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বলে সহস্র বছর ধরে রটনা করে এসেছে পুরুষতন্ত্র এবং নারীকে তা মেনে নিতে বাধ্য করেছে। ইশারা, অবগুণ্ঠন, কোমলতা, ছায়াচ্ছন্নতার অন্য নাম ভঙ্গুরতা ও অথর্বতা। পুরুষতন্ত্র নারীকে এ-সব বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে বাধ্য করে, কারণ এগুলোর মধ্য দিয়েই সহজে নারীকে চিরশৃঙ্খলিত ও পঙ্গু করে রাখা সম্ভব।

আর রোকেয়াকে পুরুষসত্তার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে আখ্যা দেয়ার মধ্য দিয়েও রোকেয়াকে অপমান ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। মনুষ্য মগজ সৃষ্টিশীলতার বিভিন্ন পথে ধাবিত হতে পারে। ওই মগজের বিকাশ ও শক্তিকেও পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে চায় লৈঙ্গিক রাজনীতি দ্বারা। রোকেয়া তাঁর সমকালের অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান লেখকের চেয়ে মননশীল ও স্বাপ্নিক ছিলেন। কিন্তু এক নারীর মধ্যে এমন মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার সমন্বয় ও তার বিচিত্র প্রকাশকে মেনে নেয়া ও স্বীকৃতি দেয়া পুরুষতন্ত্রের জন্যে হয়ে ওঠে এক মহা অসুখকর ব্যাপার। তাই নারীর ওই শক্তিকে এমন বিকৃত ও লিঙ্গান্তরিত করে দেখার উৎসাহ পুরুষতন্ত্রের। আবদুল মান্নান সৈয়দও তাই রোকেয়ার মধ্যে পুরুষসত্তার সন্ধানই পান। তাঁর গর্বী পুংসত্তা রোকেয়াকে এ- ভাবে দেখতেই স্বস্তিবোধ করেছে- কারণ এতে করে প্রশংসা করা হচ্ছে আসলে পুরুষেরই শক্তি ও প্রতিভাকে, রোকেয়া এখানে উছিলা মাত্র।

সীমাহীন স্ববিরোধ ও পুরুষতন্ত্রের প্রথা মান্য করার অন্য নামই হচ্ছে রোকেয়া। নারীর জীবন গড়ে তোলার কাজে নিবেদিত এক ব্রতী বলে মান্য হন রোকেয়া, তবে তাঁর নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছেমতো কাঠামো দেয়ার শক্তি ও ইচ্ছেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর নিজের জীবনই তাঁর নিজের তৈরি নয়; রোকেয়া নারীপ্রতিভা হিশেবে নন্দিত; রোকেয়া প্রতিভা ঠিকই, তবে স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভা। তিনি অভিজাত পুরুষতন্ত্রের কুপ্রথা ও অবরোধ পীড়নের বিরুদ্ধে মুখর, আর নিজের জীবনে অতিনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন পতিপ্রভুর পরিয়ে দেয়া

শৃঙ্খল; আমৃত্যু নিয়ন্ত্রিত হন একটি শবদেহ দ্বারা। তাঁর বিবাহিত জীবন স্বল্পকালের, বৈধ্যব্যের কাল দীর্ঘ; স্বল্প বিবাহিত জীবন কাটে তাঁর মহাপাথরের বন্দনায় আর দীর্ঘ বৈধ্যব্যের কাল কাটে মৃত পতির তৈরি করে রেখে যাওয়া ছক অনুসারে। রোকেয়া বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের জন্যে লিখে যান জ্বালাময়ী প্রবন্ধ আর নিজের জীবনে অনড় করে রাখেন অন্ধকার ও প্রথার মহিমা। রোকেয়া আদ্যোপান্ত স্ববিরোধিতাগ্রস্ত। রচনায় তাঁর ক্ষোভ ও বক্তব্য বেজে ওঠে; ব্যক্তিজীবনে তিনি যাপন করেন প্রথাগ্রস্ত, বিনীত, মান্য করে ধন্য হয়ে যাওয়া জীবন। তাই তাঁর রচনাবলী থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকানো দরকার তাঁর জীবনের দিকে; তবেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে তাঁর সত্য পরিচয় ও ভূমিকা। রোকেয়া আমূল নারীবাদী শুধু কোনো কোনো বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশে, নতুবা জীবনাচরণে ও বিশ্বাসে রোকেয়া অতি প্রথা মান্যকারী স্ববিরোধিতাগ্রস্ত পতিপ্রভুর চিরবাধ্য ও অনুগত এক বিবি ছাড়া আর কিছু নয়।

যে নারীশিক্ষার জন্যে রোকেয়া এতো উচ্চকণ্ঠ, তা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস পুরুষতান্ত্রিক ধারণা ও বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বিশ্বাস করেন নারীর ভূমিকা বিষয়ক পুরুষতান্ত্রিক সকল বিধিনির্দেশে। প্রভুর যোগ্য 'সহধর্মিনী' হয়ে ওঠার জন্যেই নারীশিক্ষার প্রয়োজন বলে তিনি বারংবার রটনা করেন। নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার কথাও রোকেয়া মাঝে মধ্যে বলেন, তবে তা নেহায়েতই উত্তেজিত ভাষণ মাত্র। নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চেয়ে তার কাছে মূল্যবান বলে গণ্য হয় পতিপ্রভুর যোগ্য অর্ধাঙ্গিনী হয়ে ওঠার ব্যাপারটি। তাই নানাভাবে নারীশিক্ষার এই একই প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন তিনি। রোকেয়ার চারপাশের নতুন আদম নারী সম্পর্কে ওই সময় পোষণ করেছেন যে-বিশ্বাস, নারীর যেমন মুক্তি তারা চেয়েছে, রোকেয়াও চেয়েছেন তা-ই। তবে নতুন আদমের মধ্যে প্রথার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ক্রোধ নেই, রোকেয়ার মধ্যে তা প্রবলভাবে আছে। তার কারণ আশরাফ পিতৃকূলের কৌলিন্যের মান রক্ষার জন্যে সামান্য লেখাপড়া শেখার সুযোগও না পাওয়ার বা নিরক্ষর থাকার পীড়ন সইতে হয়েছে রোকেয়াকে, নতুন আদমকে নয়। রোকেয়ার ক্ষোভ শুধু ওইটুকুর জন্যে। রোকেয়া ক্ষুব্ধ কিছু কিছু কুপ্রথার বিরুদ্ধে, নতুবা তার জীবন প্রথাআনুগত্যেরই অন্য নাম মাত্র।

রোকেয়া মুক্তি চান অবরোধবাসিনীর অন্ধকার জীবন থেকে, কিন্তু নিজেকে গভীর পর্দায় আবৃত করে পুণ্য সঞ্চয়ে আছে তাঁর গভীর আগ্রহ। নতুন আদমের মতো তিনিও বিশ্বাস করে নারীর বোরকা পরা দরকার কারণ–

> কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়।

নানা শ্রেণীর পুরুষের 'দৃষ্টি হইতে বা সাধারণেব দৃষ্টি (Public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য' নাবীকেই নিজেকে আবৃত করে রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে। রোকেয়াও বিশ্বাস করেন পবদা দিয়ে আবৃত না করা মানেই হচ্ছে মহা সর্বনাশ ঘটে যাওয়া। রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে নানাভাবে সন্ধি করেছেন। এ-সন্ধি নারীর কল্যাণের জন্যে নয়, নারী মুক্তির লড়াই অব্যাহত রাখার স্বার্থে নয়, তিনি সন্ধি করেছেন আরেকটি পুরুষের তৈরি করে দিয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানটিকে বহাল তবিয়তে রাখার জন্যে। রোকেয়ার লেখক হয়ে ওঠাও তাঁর আত্মবিকাশের প্রাণান্ত তাগিদের ফল নয়। পতিপ্রভুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভুর গৌরব বৃদ্ধির জন্যেই দেখা দেয় ওই সৃষ্টিশীলতা।

আটাশ বছর বয়স থেকে রোকেয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে একটি শব, একটি পুরুষের শবদেহ; জীবদ্দশায় যার নাম ছিলো সাখাওয়াত হোসেন। এ-প্রভু শুধু জীবদ্দশায় রোকেয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেই তৃপ্ত হতে পারে নি; তাঁর মৃত্যুপরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে রোকেয়া যে-জীবনযাপন করবে খুবই কৌশলে তার নিয়ন্ত্রণের অতি সুবন্দোবস্তও করে গেছে। তাঁর মৃত্যুকালে রোকেয়া যৌবনের মাধ্যাহ্নে; আটাশ বছর বয়সে তাঁকে বৈধব্য বরণ করতে হয়। সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন ১৯০৯-এ, তারপর রোকেয়াকে পাড়ি দিতে হয় প্রায় দুই যুগ এবং ৫১ বা ৫৩ বছর বয়সে ১৯৩২- এ রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। এই দুই যুগ রোকেয়া জীবন কাটান একটি মৃত পুরুষের ঠিক করে দিয়ে যাওয়া অনুশাসন অনুসারে। সাখাওয়াত তাঁর মৃত্যুপরবর্তীকালে তরুণী রোকেয়ার জীবনযাপন অনুশাসন অনুসারে। সাখাওয়াত তাঁর মৃত্যুপরবর্তীকালে তরুণী রোকেয়ার জীবনযাপন প্রসঙ্গ নিয়ে বড়োই ভাবিত ছিলেন বলে জানা যায়।

প্রভু ভাবিত ছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পরিচারিকাব অন্যের ভার্যায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কায়। বিধবা তরুণীটি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বিধবা ভার্যা থেকেই তাকে মহিমান্বিত করে চলুক- এই প্রভু মনেপ্রাণে তাই চায় এবং সুকৌশলে রুদ্ধ করে দেয় অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে রোকেয়ার স্বাভাবিক জীবনযাপনের সকল পথ। বিবাহ কখনোই জীবনের মহা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে না। এবং বিবাহ বিষয়ক যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ব্যক্তির নিজের। বৈধব্যের কালে রোকেয়াকে আবার বিবাহিত হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে হতে যে হবেই না এমনও কোনো ঐশ্বরিক বিধি শুধু রোকেয়ার জন্যেই প্রস্তুত হতে পারে না। কিন্তু রোকেয়ার পতিপ্রভু শুধু রোকেয়ার জন্যেই তৈবি করে রেখে যায় 'পুতপবিত্র বৈধব্য জীবন' অবশ্যম্ভাবী করে নেয়ার নানা বিধি।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যার বয়সীকে পুনর্বিবাহ কবতে সাখাওয়াতের বাধে না, এবং এ- কথা খুবই জোর দিয়ে বলা যায় যে যদি অকালে রোকেয়ার মৃত্যু হতো

তবে বৃদ্ধ বয়সে সেবাশুশ্রূষার অতি প্রয়োজনে 'অনন্যোপায়' হয়ে সাখাওয়াৎ আবার বিবাহ না করে পেরে উঠতেন না। কিন্তু নিজের মৃত্যুর পরে হলেও তার সম্পত্তি অন্যের অধিকারে চলে যাবে- পতিপ্রভু এ চিন্তাও মনে ঠাঁই দিতে পারে না। সে তাই রোকেয়ার সামনে ঝুলোয় মহীয়সী হবার নানা মুলো, আর রোকেয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছুটে চলে ওই মুলোর পেছনে, অতি সুখের সঙ্গে পালন করে চলে পতিপ্রভুর তৈরি করে যাওয়া সব বিধি। যেহেতু সে তুষ্ট করে পুরুষতন্ত্রের সকল চাহিদা, তাই পুরুষতন্ত্র তাকে দেয় মহামহীয়সী অভিধা। এ- ভাবে আসলে পুরুষতন্ত্র পালন করে নিজের জয়ন্তী উৎসব। কেন না মৃত পুরুষের এমন আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ রোকেয়ার জীবনে ছাড়া কোথাও দেখা যায় না।

রোকেয়াকে পুরুষতন্ত্র স্তব করে শিক্ষাব্রতী হিশেবে। রোকেয়া তাঁর বৈধব্যের কাল বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে আর বিদ্যার্থী সংগ্রহের কাজে কাটিয়েছেন এ কথা ঠিক। তবে শিক্ষা বিস্তারের কাজে রোকেয়া নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন নি। রোকেয়া এ-পথে এসেছেন, কারণ তাঁর প্রভু তাঁর বৈধব্যের কাল এ-ভাবেই কাটাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে, তাই। যদি তাঁর প্রভুর জন্যে এমন ছক তৈরি করে দিয়ে না যেতো তাহলে তার জীবন হতো ভিন্ন; অন্য কোনো ছকে কাটতো তাঁর জীবন। নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্রতী হওয়ার পেছনে রোকেয়ার নিজের উদ্যোগ ও স্বপ্ন ছিলো শূন্য; রোকেয়া পালন ও পূরণ করেছেন স্বামীর বিধি নির্দেশ ও পরিকল্পনা। আর বাঙালি মুসলমান নারীদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে রোকেয়ার বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী ছিলো উর্দুভাষী বালিকারা এবং বাঙালি মুসলমান তখনও কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার মতো সুস্থ জাগ্রত দশা প্রাপ্ত হয় নি। ১৯৩২- এ রোকেয়ার মৃত্যুকালে ওই বিদ্যালয়ে বাঙালি বিদ্যার্থীর সংখ্যা ছিলো মাত্র দু'জন।

রোকেয়া নারীশিক্ষার কাজে ব্রতী হন কারণ সাখাওয়াতই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ওই প্রভুর মনোযোগের মূল্যে অবশ্যই ছিলো নিজের শ্রেণীটির স্বার্থরক্ষা ও সুবিধা বৃদ্ধির তাগিদ। সাখাওয়াৎ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হন কারণ তাঁর নিজের জীবনে 'স্বশিক্ষিত' স্ত্রী থাকার নানা ফজিলত তিনি পান। অফিসের ছোটোবড়ো নানা কাজ গৃহে ওই পত্নীপরিচারিকাকে দিয়ে সহজেই করিয়ে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, এবং এমন পরিচারিকা পাবার সুযোগ যাতে তাঁর গোত্রের সকলেই লাভ করে সেজন্যেই সাখাওয়াৎ নারী শিক্ষার পক্ষপাতী হন। সাখাওয়াতের মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে তাঁর বন্ধুজনেরা যেসব স্মৃতিকথা লেখে, তাতে তন্নতন্ন করে ফুটে ওঠে ওই প্রভুর অভিসন্ধি ও চাতুর্য :

> সুশিক্ষিতা মিসেস রোকেয়া হোসেন এইরূপ ইংরেজি শিখিয়াছিলেন যে, সাখাওয়াতের কথামত ইংরেজিতে লিখিয়া তাঁহার সরকারি কার্যের অনেকটাই সাহায্য করিতে পারিতেন ...। পত্নীর সাহায্যে তাহার

> পারিবারিক জীবন সুখের হইয়াছিল বলিয়া তিনি মুসলমানদের বহু বিবাহ, নাচ, মুজবা প্রভৃতির প্রকৃত প্রতিষেধক ভাবে স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

নিজের সুস্থ অবস্থায় রোকেয়াকে দিয়ে পি. এ- র কাজ করিয়ে আর নানা রকম ফ্যান্টাসি লিখতে উৎসাহ দিয়েই প্রভু তুষ্ট থাকে; রোকেয়াকে তখন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে পাঠিয়ে দেয় না বা রোকেয়াও ওই কাজের জন্যে কোনো উদ্যোগ নেয় না। রোকেয়া উদ্যোগ নেয় নি কারণ তাঁর প্রভু উদ্যোগ নেয় নি। যখন দেহে অবধারিত হয়ে ওঠে জরা ও মৃতু, তখনই প্রভু উদ্যোগী হয়ে ওঠে পত্নীকে 'স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের' মহতী কাজে উৎসর্গ করার জন্যে। ওই প্রভু আসলে এমনটি করে পরিচারিকার ওপরে তাঁর চিরপ্রভুত্ব বজায় রাখার পরিকল্পনা থেকে এবং রোকেয়াকে ঠেলে দেয় চিরবিকলাঙ্গ অস্বাভাবিক অন্তঃসারশূন্য বিধবা 'মহীয়সী'র জীবনযাপন করতে। আর রোকেয়া ওই জীবন অতি আহ্লাদের সঙ্গে যাপন করে চলে। কারণ যে শক্তি বলে দেখা সম্ভব ওই গোপন পীড়ন, লুকোনো ষড়যন্ত্র ও শৃঙ্খলকে, সে শক্তি রোকেয়া অর্জন করতেই চান নি। যদিও জাগ্রত চেতনাসম্পন্ন হবার, স্বনির্ভর মানুষ হয়ে ওঠার সকল শক্তি ও সম্ভাবনা তাঁর মধ্যেই ছিলো, প্রবলভাবেই ছিলো; কিন্তু সে দুর্গম কঠিন পথ পরিহার করেছেন রোকেয়া নিজেই। তিনি গেছেন প্রথাগততার ছায়াময় পথে; পুরুষতন্ত্রের 'প্রগতিপন্থী' দের সমর্থন ও আনুকূল্যের মধ্যে দিয়ে। তাঁর লড়াই নারী মুক্তির লড়াই নয়। তাঁর লড়াই অতি রক্ষণশীল গোঁড়াদের সঙ্গে; যারা নারীকে নতুনকালে নতুনবিদ্যা সামান্য আয়ত্ত করে নতুন আদমের যোগ্য অর্ধাঙ্গিনী হতেও বাধা দিয়েছিলো, রোকেয়ার প্রতিপক্ষ ছিলো তারা।

সাখাওয়াৎ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে স্ত্রীকে নিয়োজিত করার কথা ভাবেন এ- কারণে যে 'এতে স্বামীর মৃত্যুর পরেও রোকেয়া স্ত্রীশিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করে পবিত্র ও শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন।' অর্থাৎ রোকেয়াকে এ- পথে ঠেলে দেয়ার পেছন আছে শবদেহ শাসিত এবং শবদেহ ধ্যান করে চলার 'পবিত্র ও শান্তিময় জীবন'-এ চিরবন্দি রাখার অভিসন্ধি, অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নয়। অন্য নানা বাস্তব উদাহরণ থেকেও রোকেয়ার প্রতি তাঁর প্রভুর নৃশংসতার ও হীনতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাখাওয়াতের সঞ্চয়ের পরিমাণ যৎসামান্য ছিলো না, তা ছিলো উল্লেখযোগ্য অঙ্কের। কিন্তু ওই অর্থ থেকে সামান্য অর্থ মাত্র তিনি রেখে যান তাঁর বিধবার জন্যে, যাঁর জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো উপায় নেই, অবলম্বন নেই, যাঁর কোনো আশ্রয় নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই; তাকেই গৃহহীন করে বিষয় আশয় ও মোটা অংকের টাকা সাখওয়াৎ বরাদ্দ করে যান প্রথম পক্ষের বিবাহিত কন্যা জন্যে।

> মিতব্যয়ী সাখাওয়াতের সত্তর হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি পত্নীর দ্বারা একটি মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে দশ হাজার টাকা দিবেন; পত্নীকে দশ হাজার দিবেন এবং বাড়ি এবং অধিকাংশ টাকা কন্যাকে জীবদ্দশায় লিখিয়া দিবেন এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন এবং সেইরূপই অনেকটা করিয়াছিলেন...।

রোকেয়ার জন্যে এবং বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে সমান অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ হবার কারণ অতি স্পষ্ট। রোকেয়াকে বৈধব্যের কাল কৃচ্ছ্রতায় কাটাবার এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাবার ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্যেই প্রভু এমন ব্যবস্থা করে। আর ওই তরুণীকে নিয়ন্ত্রণ করার শৃঙ্খল প্রস্তুতের এককালীন প্রস্তুতির জন্যে এমন অর্থ বরাদ্দ করতে প্রভু মুক্তহস্ত ও দরাজ হওয়াই স্বাভাবিক। রোকেয়ার জীবন হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে মান্য করার ও মান্য করে নিজেকে ধন্য করার বাস্তবরূপ মাত্র। প্রভুর এমন অন্ধত্ব তাঁকে তাই ক্ষুব্ধ করে না। প্রভুকন্যার পীড়নে স্বামীর ভিটা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েও তাই রোকেয়া প্রভুর প্রদর্শিত পথ থেকে একচুল বিচ্যুত হয় না। তার এই মর্ষকামিতা ও স্বেচ্ছাদাসীত্বকে অচিরেই পুরুস্কৃত করা হয়। তাঁর স্তব রচনা করে পুরুষতন্ত্র এভাবে :

> তাহার অসামান্য এবং পতিব্রতা পত্নী স্বামীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া পবিত্রাত্মা স্বর্গীয় সাখাওয়াতের স্মৃতির পূজা করিতেছেন।

রোকেয়ার স্কুল চালনা প্রকৃত অর্থেই স্বর্গীয় প্রভুর স্মৃতির পূজা ছাড়া আর কিছু নয়। রোকেয়ার মধ্যে স্ববিরোধ বিস্তর। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি নিয়তই দুলেছেন দ্বিধা ও অস্পষ্টতার দোলায়। যদিও এক আধবার মেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে ছেড়ে দেয়ার মতো উত্তেজক কথা তিনি বলে উঠেছেন, কিন্তু তার ভেতরেও অনড় হয়েছিলো পুরুষতান্ত্রিক ওই বিশ্বাস যে নারীর শিক্ষা প্রয়োজন শুধু প্রভুর যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে ওঠার জন্যে। যেমন তিনি নিজে হতে পেরেছিলেন, অন্যরাও যেনো তা হয়ে উঠতে সমর্থ হয়- বারংবার রোকেয়া ব্যক্ত করেন সে- কথা। নারীশিক্ষার এমন প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি ব্যক্ত করেন উপন্যাসে, বলেন নানা প্রবন্ধে, স্কুলের বাৎসরিক বৈঠকের বক্তৃতায়ও। সর্বত্র তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেন একই বিশ্বাস। পদ্মরাগ উপন্যাসে ব্যক্ত হয় রোকেয়ার এমন বিশ্বাস ও সংকল্প :

> ছাত্রীদিগকে দুইপাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী

> ভিন্ন। ... নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চবিত্রগঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

নারীর যে ভূমিকা পুরুষতন্ত্র নির্দেশ করেছে বোকেয়া ওই ভূমিকাকে স্বতঃসিদ্ধ বলেই মান্য করেন এবং এই ভূমিকায় সাফল্য অর্জনের জন্যেই নারীশিক্ষা অতি জরুরি বলে তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস-

> ক. আমি চাই সেই শিক্ষা- যাহা তাহাদিগকে নাগবিক অধিকাব লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত কবিবে।
>
> খ. আমবা উচ্চ শিক্ষা লাভ (অথবা Mental culture) করিব কিসের জন্যে? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়াব নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।

নারী তার বিদ্বান পতিপ্রভুর জ্ঞান, বিদ্যা ও উচ্চপদের মহিমা বুঝতে পারছে না বলেও রোকেয়া কাতর হয়ে ওঠেন :

> কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্য সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যাব গতিব সীমা নাই, স্ত্রীদেব বিদ্যার দৌড় সচরাচর বোধোদয় পর্যন্ত।

তাই নারীশিক্ষার জন্যে রোকেয়ার সকল উদ্যম, শ্রম এবং 'জ্বালাময়ী ভাষণ' কে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিরা যতোই মহিমান্বিত করে তুলুক না কেনো, ওই সকলই বাঙালি মুসলমান নারীর প্রকৃত মুক্তির পথে কোনো ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয় নি। বরং এসব কিছুও নারীর ভূমিকা বিষয়ক পুরুষতান্ত্রিক অপবিশ্বাস ও প্রচারণা নারীর মনে বদ্ধমূল করে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এবং পরে বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে নারীকে ওই ভূমিকা সুষ্ঠুরূপে আয়ত্ত করাবার তাগিদে, নারী মুক্তির জন্যে নয়। নারীর বিকাশের কালেই এ-ভাবে তার সুস্থ বিকাশের সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ করে, তাকে ঠেলে দেয়া হলো অবধারিত পঙ্গুত্ব ও অস্বাভাবিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠার দিকে। তাই এখন চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী নারী চিকিৎসকও গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে আগে তাকে সামলাতে হবে সংসার, পরেই পেশা। তাই বিকেলে রোগী দেখতে না গিয়ে ননদের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান সামলানোর দায়িত্ব পালনেই সে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়, আর তার চেম্বারে এসে বসে থেকে রোগীকূল বিরক্ত হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু কোনো পুরুষ চিকিৎসক

কখনোই এমনটি করে না, কারণ তার পেশা তার অস্তিত্ব রক্ষার মাধ্যম। এই বোধ তার মনে শক্তপোক্ত করে গেঁথে দিয়েছে পুরুষতন্ত্র। নারীর মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তার উল্টো ধারণা। এ- ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে রোকেয়াও অগ্রণী ভূমিকাই পালন করেছেন।

রোকেয়ার মধ্যে আছে অতি স্ববিরোধিতা, আর তিনি প্রতিধ্বনিত্ব করেন পুরুষতন্ত্রের তৈরি করা নানা অপবিশ্বাস ও বিধি। তিনি খুবই শ্রেণী সচেতন, তার নিজের শ্রেণীর আভিজাত্য আদবকেতার শ্রেষ্ঠতা নিয়ে তার মনে আছে খুবই চাপা অহংকার। আশরাফকুলের পিতাপ্রভুদের ওপর রোকেয়া চটা ছিলেন, কিন্তু রোকেয়ার নিজের ভেতরেই ছিলো উন্নাসিক, গোঁড়া এক গর্বমত্ত আশরাফ। রোকেয়া আশরাফ পুরুষতন্ত্রের উগ্র অবরোধপ্রীতি আর মেয়েদের নিরক্ষর রেখে কৌলিন্যবোধ করার মানসিকতার ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন, কিন্তু আশরাফদের সহবত, আদবকেতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তার ছিলো অতি উঁচু ধারণা, আর আতরাফদের প্রতি ছিলো তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা ও ঘৃণা। যদি আশরাফ প্রভুরা সহজেই কন্যাদের বিদ্যাশিক্ষা দিতে সম্মত হতো বা বিদ্যাশিক্ষার রেওয়াজ চালু করতো তাহলে রোকেয়ার ক্ষোভ কিছুই থাকতো না, বরং শ্রেষ্ঠ আশরাফকুলের মর্যাদা ও মহিমা কীর্তনমূলক নানা রচনা তিনি তৈরি করে চলতেন।

রোকেয়ার সমকালের বেগমকুলের সকলেই হয় আত্মরতিপরায়ণ, নয় তো নিজের গোত্রের নারীর ব্যথার কাতর। তাঁরা কেউই নিজের শ্রেণীর বাইরে তাকাবার রুচি বোধ কবেন না। রোকেয়া নিম্নশ্রেণীর সাধারণ নারীর দিকে তাকান, তবে বিদ্বেষভরা উপহাসের দৃষ্টিতে তাকান তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে সাধারণ আতরাফ নারীরা অতি নিকৃষ্ট জীব ছাড়া কিছু নয়। রোকেয়া নারীশিক্ষার জন্যে 'প্রাণপাত' করেছেন; কিন্তু সাধারণ নারীর পর্দামুক্ত সংগ্রামপূর্ণ স্বাবলম্বী জীবনের প্রতি তাচ্ছিল্য বোধ করেছেন এবং তার শিক্ষিত' নারীর জন্যে ওই স্বাবলম্বী জীবনের কথা তিনি আদৌ ভাবেন নি। রোকেয়ার নারীশিক্ষা তাই নারী মুক্তি নয়; নারীর সুগৃহিণী হয়ে ওঠা ও পতিপ্রভুর যোগ্য সহধর্মিনী হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠার উপকরণ মাত্র। রোকেয়ার নারীশিক্ষা সম্পর্কিত এমন মনোভাবই ব্যক্ত হতে দেখা যায় তাঁর একটি অভিভাষণে। 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' শীর্ষক অভিভাষণটিতে রোকেয়া এমন বিশ্বাস ব্যক্ত করেন :

> স্ত্রীশিক্ষা অভাবে আমাদের খরচের খাতা নানা প্রকারের খরচ লিখতে লিখতে ক্রমশ ভারী হয়ে চলেছে। আমাদের সমাজের খরচের খাতা কিরূপে বেড়ে যাচ্ছে, তার একটু আভাস দিচ্ছি। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম যুবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন

দিচ্ছেন যে গ্রাজুয়েট পাত্রী না পেলে তারা বিয়ে করবেন না। মোসলেম সমাজে যদি একান্তই গ্রাজুয়েট মেয়ে না পাওয়া যায়, তবে তারা খ্রিস্টান হয়ে যাবেন।... কোন ভদ্রলোক বায়না ধরেছেন যে, আই. এ পাশ পাত্রী চাই। কেউ চান অন্তত ম্যাট্রিক পাশ, তা না হলে তার খ্রীস্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবেন। এসব বিকৃত রুচির প্রধান কারণ বর্তমান ধর্মহীন শিক্ষা। ... উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের ঘরে এখন "এম. এ পাশ" বউ না হলে আলো হয় না। কিন্তু এজন্যে সে বেচারাদের গালাগালি না দিয়ে বরং যাতে তাঁরা আমাদের হাতছাড়া না হন, তারই ব্যবস্থা করতে হবে। আমার আরো জানা আছো যে অনেক বিকৃত- মস্তিষ্ক ধর্মহীন লোক উপযুক্তা বিদূষী ভার্যার হাতে পড়ে শুধরে গিয়ে চমৎকার পাকা মুসুল্লী হয়েছেন।...

ফলকথা উপরোক্ত দুরবস্থার একমাত্র ঔষধ- একটি আদর্শ মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় ... আদর্শ মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মুসলিম নারী গঠিত হবে- যাদের সন্তান-সন্ততি হবে হযরত ওমর ফারুক, হযরত ফাতেমা জোহরার মতো।

রোকেয়া নারী মুক্তির জন্যে নারীশিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন না, প্রভুর সব ধরনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়ে ওঠার জন্যে নারীশিক্ষার ওপর জোর দেন। আর বঙ্গদেশ অসংখ্য হজরত ওমর ও ফাতেমা জোহরায় ভরে দেয়ার সুযোগ্য যন্ত্রে পরিণত হবার জন্যে নারীকে শিক্ষিত হতে বলে। অর্থাৎ সহধর্মিনী ও সুজননী হওয়ার জন্যেই দরকার নারীর শিক্ষা গ্রহণ। এমন নারী মুক্তির পক্ষে মহাক্ষতিকর বিশ্বাস পোষণ করেন বলেই রোকেয়ার কাছে সাধারণ নারীর সক্রিয়তা ও স্বাভাবিকতা অতি দূষণীয় বলে গণ্য হয়। নিম্নশ্রেণীর নারী তার কাছে ঘৃণ্য, কারণ তারা অভিজাতদের মতো পরদা পালন করে না। রোকেয়ার বিশ্বাস-

বলি উন্নতি জিনিসটা কি ? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে ? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে জেলেনী, চামারনী, কি ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

তাঁর চক্ষু বিশেষ খাপে ঢাকা বলেই নিম্নবর্ণের নারীর সক্রিয়তা ও বলিষ্ঠতা তার চোখে পড়ে না, কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্যে ওই নারীদের পর্দাহীন চলাফেরা তার কাছে 'বেশরিয়তি' বলে সহজেই গণ্য হয়। ওই 'বিশেষ খাপ' রোকেয়া পান পুরুষতন্ত্রের কাছ থেকে এবং প্রীতমনে চিরদিন চোখে জড়িয়ে রাখেন।

রোকেয়াও পুরুষতন্ত্রের নানা মাপের প্রভুর ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস দ্বারাই অনুপ্রাণিত এবং ওই বিশ্বাস প্রচারের কাজে নিজেকে ভালোভাবে সপে দিয়েছেন।

তিনি অবরোধের অন্ধকারে বাস করাকে অপছন্দ করেন; ওই সময়ের নতুন আদমও তাই অপছন্দ করেছে। তবে নতুন আদম বিবির সর্বাঙ্গ বোরকা মুড়ে রাখার পক্ষপাতী, রোকেয়াও অমন বোরকামুড়ে বেরুনোকে 'উন্নতির অন্তরায়' বলে গণ্য করেন না। বরং তার মনে হয়; 'আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশি বিরোধ নাই।' একই সঙ্গে রোকেয়া 'পর্দার' বেশ জাঁকালো ব্যাখ্যাও দেন :

> পর্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি-কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই 'বে- পর্দা' বলি।

পতিপ্রভুরা ওই বোরকা মোড়াদের নিয়ে যে 'অগ্রসর' জীবনযাপন করা শুরু করেছিলো এবং রোকেয়া তাঁর প্রতিপ্রভুর নির্দেশে যেমন 'অগ্রসর' জীবন কাটিয়েছিলেন তার একটি বিশদ বিবরণ ফুটে ওঠে রোকেয়ার এই বর্ণনায় :

> আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না।

এখানে রোকেয়া শুধু বোরকার পক্ষেই কথা বলে নি। বোরকার অবশ্যকীয়তা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বোরকার ব্যবহার বিধিও বর্ণনা করেন। এবং বোরকা পরেও সাবলীলতা আয়ত্তের জন্যে এমন নির্দেশ দেন- 'তবে সেজন্যে সামান্য রকমের একটু অভ্যাস চাই; বিনা অভ্যাসে কোন কাজটা হয় ?' রোকেয়া পাথর চাপা ঘাসের জীবন নিয়ে ক্ষুব্ধ নন, আর শেকলও তাঁর কাছে পীড়াদায়ক নয়। মুক্তির পথে যাবার জন্যে দরকার সকল শৃঙ্খল মোচন। রোকেয়া শৃঙ্খল মোচনের যোদ্ধা নন; নানারকম শৃঙ্খল নানাভাবে জড়িয়ে নেয়ার পরামর্শদাতা তিনি। বশীভূত আপোষকামী ও চির মান্যকারী বলেই শেকলসহ কতো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা যায় তা তিনি জানান ও অন্যদের স্বচ্ছন্দে চলাফেরা শেখার জন্যে অনুশীলন করতে বলেন। শেকল নিয়ে তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই, তবে শেকলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে তাঁর বেশ মাথাব্যথা আছে। তিনি চান শেকল থাকুক, কিন্তু ওই শেকল হয়ে উঠুক আরো সুদর্শন। এমন বোধ ও উপলব্ধি কোনো জাগর চৈতন্যসম্পন্ন মানুষের হতে পারে না। প্রভুর কাছে রোকেয়ার শেকল বিষয়ে সাধ বা দাবি এমন :

> সচরাচব বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (Fine) করিতে হইবে। জুতা কাপড় প্রভৃতি যেমন ক্রমশ উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বোরকারও উন্নতি প্রার্থনীয়।

তাই রোকেয়া শেকল মুক্তির লড়াইরত লড়াকু মানুষ নন, যদিও তাঁর রচনাবলী পাঠে জাগে অমনই বিভ্রম। রোকেয়া পাথর চাপা ঘাস বা স্বামীর ছাঁচে বিকশিত এক পরিতৃপ্ত বেগম, এখন নারী মুক্তির অগ্রদূত বলে যে পেয়েছে ভুল প্রসিদ্ধি।

২. নূরন্নেছা খাতুন ও অন্যরা

নূরন্নেছা খাতুন পতিপ্রভুর ছাঁচে বিকশিত লেখক প্রতিভা। প্রভুর নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি দেখা দেন উপাখ্যান লেখক রূপে এবং বিশেষ বিশেষ উপাখ্যান রচনার মধ্য দিয়ে পালন করে চলেন প্রভুর নির্দেশ। তবে প্রভুর তাঁর প্রতিভা হিশেবে প্রসিদ্ধি পাবার সকল বন্দোবস্ত সম্পন্ন করলেও, নিজেকে তিনি প্রতিপ্রভুর চরণাশ্রিত দাসী ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না এবং যে কোনো ছুতোয় নিজের তিনি ওই পরিচয় সগৌরবে ঘোষণা করেন। তিনি বহু উপাখ্যান লিখেছেন তবে ওগুলোর সাহিত্যমান নিম্ন। অতি ভাবালুতার মুদ্রিত রূপ হচ্ছে ওই উপাখ্যানগুলো। নূরন্নেছা তার জীবন ও জীবনের প্রাপ্তি নিয়ে অতি প্রসন্ন ও সুখী। রোকেয়া তাঁর পিতৃকুলের কিছু কিছু গোঁড়ামির ওপর ক্ষুব্ধ, নূরন্নেছা পরম পরিতুষ্ট সকল ব্যবস্থা ও তাঁর অবস্থা নিয়ে। রোকেয়া কন্যাদের ওপর আশরাফ পিতৃকুলের কিছু কিছু অবিচারে ব্যথিত; কিন্তু পতিপ্রভু নতুন আদমের 'দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতায়' গদগদ। আর নূরন্নেছা পিতৃকুলের প্রতি ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ খুঁজে পান না, সকল প্রথারীতি তিনি স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে বিশ্বাস করেন এবং পতিপ্রভুর 'দয়া দাক্ষিণ্যে' তিনি রোকেয়ার মতোই মুগ্ধ গদগদ। নূরন্নেছা নিজের অভিজাত পিতৃকুলের বনেদী পরিমণ্ডলের বিবরণ এভাবে নিবেদন করেন :

> প্রাচীন ভদ্রবংশীয় মোসলমান, আয়মাদাব কন্যা বিধায়ে এবং কঠিন পর্দাবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা খুবই কম। বলিতে কি পিত্রালয়ে অবস্থানকালে অষ্টমবর্ষ পূর্ণ হইবার পর চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত অন্দর ও মস্তকোপরি চন্দ্রতারকাখচিত নীল চন্দ্রাতপ ভিন্ন, কোনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার নয়ন পথের পথিক হয় নাই।

তাঁর ওই 'ক্ষতি' পুষিয়ে যায় পতিপ্রভুর দয়ায়। নূরন্নেছার স্বামী কাজী গোলাম মোহাম্মদ উচ্চ ইংরেজিশিক্ষিত নতুন আদম, কর্মজীবনে যিনি কৌশুলি হিশেবে প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর সময়ের তাঁর গোত্রের অন্য নতুন আদমের মতোই কাজী গোলাম মোহাম্মদও তাঁর জীবনে আমদানি করতে তৎপর হন শাসক প্রভুর 'উন্নত' জীবনযাপন প্রণালী। কর্মস্থলের অবকাশগুলো নানা শৈলনিবাসে বেড়াতে যাবার মধ্য দিয়ে কাটে তাঁর, আর এই নতুন আদমও সঙ্গে নিয়ে যান

বোরকামোড়া বেগমরত্নকে, বোরকার ভেতর থেকে প্রকৃতি দেখার সুযোগ পেয়ে যে বর্তে যায় :

> স্বামীর দেশ পর্যটনটা ক্রমশ অভ্যাস দ্বারা স্বভাবগত হইয়া পড়ায় বিবাহের বৎসর অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সাল হইতে আমিও জেলের কোমরেব হাড়ির ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এদেশ-ওদেশ যাইতে আরম্ভ করিলাম এবং তজ্জন্যই কঠিন Strict পর্দা ক্রমশঃ আপনা আপনিই একটু শিথিল ভাবাপন্ন হইয়া আসিল। এই হইতেই আমার সামান্য অভিজ্ঞতা।

নূরন্নেছা এখানে অতি বিনয়ের সঙ্গে জাহির করেছেন পতিপ্রভুর গরবে তিনি কতোটা গরবিনী ওই সত্যটি। রোকেয়াও একই রকম পতিগর্বে গরবিনী, পতির দাক্ষিণ্যে ধন্য। প্রভুর ছুঁয়ে দেয়া একটি দুটি হাড়ই যাদের তুষ্ট করে তোলে, তারা কখনো নিজের জগৎ নিজে খুঁজে নেবার পথে পা বাড়ায় না। নূরন্নেছা নিজের সুখ ও গৌরব জাহির করতে গিয়ে নিজেই তুলে ধরেছেন এই বেগমকুলের প্রকৃত অবস্থাটি। তিনি ব্যবহার করেছেন এমন একটি উপমা যা এখনও মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান নারীকুল সম্পর্কে সমান প্রযোজ্য এবং নূরন্নেছা থেকে শুরু করে এই বর্তমানাদের সকলেই নিজের এমন পরিণাম লাভেই কৃতার্থ বোধ করে। নূরন্নেছা শুধু নিজেকে 'জেলের কোমরের হাড়ির ন্যায়' বলে নির্দেশ করেছেন, তবে এমন শুধু তিনি বা তাঁর সমকালের বেগমেরাই নন, এমন তাদের এই বর্তমান উত্তরসূরিরাও। বর্তমানাদের সঙ্গে ওই পূর্বসূরিদের পার্থক্য হচ্ছে পূর্বসূরিরা নিজের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করার জন্যে ব্যবহার করেছেন আদিম উদাহরণ আর বর্তমানারা প্রয়োগ করে সুভাষিত নানা বুলি ও বাগাড়ম্বর। তবে উভয়েরই অবস্থা অভিন্ন।

এই বর্তমানের চারপাশের বুদবুদকুলের অতি উৎকৃষ্ট পূর্বসূরি নূরন্নেছা খাতুন। নূরন্নেছা এবং তার উত্তরসূরিদের অভিহিত করা যায় উভচর নারীগোত্রে নামে। উভচর প্রাণীর মতো এঁরা প্রয়োজনে জলে নেমে আসে, আবার দরকার মতো ডাঙায় চরে বেড়ায়। অজাগ্রত কিন্তু নারীমুক্তির জন্যে ক্ষতিকর অতি সুবিধাবাদী নারীগোত্র এরা যখন অবরোধে পর্দা মান্য করা দরকার হয়, তখনই ওই প্রথা মান্য করে প্রসন্ন জীবন কাটায় নূরন্নেছা, আবার যখন দরকার হয় 'শিথিল ভাবাপন্ন' পর্দাবাদী হওয়া, তখনও তা হতে দেরি হয় না। নূরন্নেছার পরবর্তীরা, এখন এ- ভূখণ্ডে যাদের বসবাস, তারা পুরুষতন্ত্রের কাছ থেকে সুবিধা পাবার লোভে বা নানারকম ফায়দা লোটার জন্যে এখন অবলীলায় ধর্মেও আছে আবার নানা সেমিনার ও পার্টিতেও আছে। ঘোমটায়ও আছে আবার বিউটি পার্লার মিনাবাজার বা শপিং-এও আছে।

পুরুষতন্ত্র যখন তাদের যে ভূমিকায় চায় তারা তখনই পালন করে ওই ভূমিকা। আজান শুনে মুহূর্তে তাদের মাথায় ধর্ম উঠে আসে, সুরা পড়ার অনুষ্ঠানে ঝুপঝাপ মাথায় ঘোমটা তুলে দেয় তারা; আবার অঙ্গের বহু এলাকা রঙিন করে এবং অঙ্গের বহুরকম প্রদর্শনী করে যায় সামাজিক সকল এলাকায়।

পতিপ্রভু তাদের মস্তো খুঁটির জোর। যার বলে ও যার তেলেসমাতের জোরে তারা অনায়াসেই নানা সংঘে প্রবেশাধিকার লাভ করে, কেউ কেউ নারীসংঘের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, নূরন্নেছা যেমন হয়েছিলেন। প্রভুর কল্যাণে সাহিত্যমূল্যহীন উপাখ্যান লিখেও আর সামান্য লেখাপড়া শিখেও 'মোসলেম মহিলা সহিত্য সংঘের' সভাপতির আসন অলকৃত করতে কোনো অসুবিধা হয় না তাঁর। এবং ওই পদে আসীন হয়ে নূরন্নেছা প্রভু আদমের নানা ফাঁকাবুলিরই প্রতিধ্বনি রচনা করেন-

> স্ত্রী শিক্ষা- এটা নিশ্চয় আজকাল আমাদের অপরিহার্য জিনিসের মধ্যে হয়ে পড়েছে। এইটি আমাদের রুগ্ন সমাজে নাই বল্লেই চলে। তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন সকল রকমে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্বলতার আমরা এত নিম্নস্তরে নেমে চ'লেছি যে, ভাবতে গেলে ভবিষ্যৎ জীবনগুলো সেখানকার অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কথাগুলো শুনতে বেশ ভালো শোনায়, কিন্তু এগুলো ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছু নয়। অন্তঃসারশূন্য এমন নিরর্থক কথা বলার রেওয়াজ তখন প্রভু আদমের মধ্যে চালু ছিলো বলেই তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দিয়েছে এমন আওয়াজ। তবে এ-বেগমকুলের একটি নতুন বাসনা ব্যক্ত হয় নূরন্নেছার অভিভাষণে। যে বিবিকুল আগে সংসারের সকল কর্ম সেরে বিকেলে কোনো না কোনো বাড়িতে মিলিত হয়ে নানা সদ্‌কথা বলার শিক্ষা পেয়েছিলো পতিপ্রভুর কাছে, তারা এখন চায় নতুন পরিবেশে পরস্পর মিলিত হতে। তবে এ-বাসনা তাদের মধ্যে পতিপ্রভুই জাগিয়ে দিয়েছে। যে নতুন আদম এখন শাসকের জীবনযাপন প্রণালী রপ্ত করার কসরত করে চলেছে, সে-ই বিদেশী শাসকপত্নীদের জীবনযাপন প্রণালী চালু করতে তৎপর হয়ে উঠেছে তার বোরকামোড়া বেগমের জীবনেও। নূরন্নেছা চান :

> আজ যেমন এই মহিলা সমিতির একটি অধিবেশন আমরা এখানে কল্লাম, এই রকমের মিটিং প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে করতে পাল্লে, সমাজের ক্রন্দনের বদলে হাসির রোল আপনা আপনি আমাদের কানে এসে ঝংকার দেবে, আমাদের আশাবৃক্ষ দেখতে দেখতে ফুলে ফুলে শোভিত হবে।

প্রভুকুল চায় বলেই বিবিকুল এখন চায় মহিলা সমিতি গড়ে সেখানে মিলিত হতে এবং এ- ভাবে নারীমুক্তি সম্পন্ন করতে। নূরন্নেছাকে দিয়ে যে- ধারার

সূত্রপাত তা মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান নারীর জীবনে পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে পঞ্চাশের দশকে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর এ-ভূখণ্ডে দেখা দেয় আই. এ পাশ, বি. এ ফেল, ম্যাট্রিক পাশ বেগমেরা, যাদের পতিপ্রভুরা ছিলো নানা মাপের আমলা। পতিগৌরবে গরবিনী ওই বেগমেরা তাদের প্রাত্যহিক পরজীবী জীবনেব অনেকটা সময় কাটায় মহিলা সমিতি নামক নিরর্থকতায় মত্ত থেকে, আর মীনাবাজারের আয়োজন করে। তাদের পতিপ্রভু শক্তিমান বলে তারা নানাভাবে প্রসিদ্ধি পায়। এখনও প্রসিদ্ধি পাওয়ার ওই পথ মজবুত রয়েছে।

এ-পথে প্রসিদ্ধি পাবার জন্যে মেধা ও পরিশ্রম দরকার হয় না; পতিপ্রভুর শক্তি, যোগ্যতা, সামাজিক যোগাযোগ ও পতিপ্রভুর করুণা দরকার হয়। বিবি বা বেগমের মেধা ও পরিশ্রম করার শক্তি থাকলেও প্রভু কখনোই ওই শক্তি কাজে লাগাবার কোনো সুযোগ দেয় না। বরং নষ্ট করে পরিচারিকার ওই শক্তি, যাতে নিজের যোগ্যতায় সে কখনো দাঁড়াতে না পারে। তাই নানা কৌশলে বহাল রাখে পরিচারিকার পরগাছা থাকার সকল ব্যবস্থা। তাকে বিভ্রান্ত করে সহজে সিদ্ধি লাভের চটক দিয়ে। তবে শুধু প্রভুর ইন্দ্রজালেই নারী বিভ্রান্ত হয় না, এখন সে নিজেও নিজেকে বিভ্রান্ত করে রাখে তার নিজের দুশ্চরিত্রতার কারণে। তাই পরগাছা হতে পেরে সে এমন ঝলমলিয়ে ওঠে।

নূরন্নেছার জন্যে তাঁর পতিপ্রভু তৈরি করে দেয় উপাখ্যান লেখক হয়ে ওঠার ছাঁচ আর তাকে 'বিদ্যাবিনোদিনী' বানাবার জন্যে চালায় নিরন্তর চেষ্টা। তবে নূরন্নেছার মানবজন্ম সার্থক করে তোলার জন্যে প্রভু এমন মহানুভব হয়ে ওঠে নি, প্রভুর এই মহানুভবতা প্রদর্শন আসলে নিজেকেই খ্যাতিমান করে তোলার জন্যে। নূরন্নেছাও পিতৃগৃহে নিজে নিজেই শেখে বর্ণ পরিচয় :

> জীবনে কখনও পাঠাগারে বেঞ্চে বসার আস্বাদ পাই নাই। কখনও কোন শিক্ষকেব নিকট পাঠার্থে বই খুলিয়া বসি নাই। আপন কৌতূহল নিবারণার্থে আপনা আপনি সামন্য ক, ব, ঠ শিখিয়া দুচারিখানি বই হাতে কবিয়াছি মাত্র।

ওই 'যৎসামান্য অভিজ্ঞতামূলেই' তিনি অন্তঃপুরে অবকাশে 'পুস্তিকা রচনা' করে চলেন। এ-ব্যাপারটি তার অবকাশ বিনোদনের বিষয়ই থেকে যেতো যদি পতিপ্রভু বিষয়টিকে লুফে না নিতেন। বিবির হাতে বোনা গলাবন্ধের মতো বিবির লেখা আখ্যানও জনসমক্ষে প্রদর্শন করে গৌরবশালী হয়ে ওঠার সুযোগ এ-আদম নষ্ট করে না। পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের বন্দোবস্ত করার চেয়ে একেবারে গ্রন্থ প্রকাশই করে ফেলেন পতিপ্রভু এবং প্রভু নিজেই অবতীর্ণ হন প্রকাশকের ভূমিকায়। এ-ভাবেও সহজে কিস্তিমাতের স্বাদ আস্বাদ করার নষ্টসৌভাগ্য অর্জন

করে বাঙালি মুসলমান নারী। এবং ওই নষ্ট সৌভাগ্যের কথা ও এমনভাবে সহজে সিদ্ধি লাভ করার জাদুমন্ত্র বাঙালির মুসলমান নারীর সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করে চলে নূরন্নেছার গ্রন্থটি। লেখাপড়া জানা বাঙালি মুসলমান নারী জানলো তার লেখক হওয়া মোটেই কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। একটু লিখতে জানারই নাম এখন তাই তার কাছে লেখক হয়ে ওঠা। পতিপ্রভুর উৎসাহে বেগম ক্রমাগত রচনা করে চলে উপাখ্যানের পর উপাখ্যান আর পতিপ্রভু ওই সব আবর্জনা উৎপাদনকারীকে বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীকুলের মধ্যমণি করে তোলার জন্যে করে চলে নানা ব্যবস্থা। নূরন্নেছাকে রোকেয়ার মতো তপস্বিনী হবার পথে ঠেলে দেয় না পতিপ্রভু, ঠেলে দেয় বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সংস্কৃতির ফাঁকা ময়দানে। তাঁকে করে তোলে বিদ্যাবিনোদিনী।

নূরন্নেছা লিখেছেন অনেকগুলো সামাজিক আখ্যান আর একটি ঢাউস ঐতিহাসিক উপাখ্যান। তাঁর সামাজিক উপাখ্যানগুলোতে আছে নারীর আত্মোৎসর্গের মহিমার কথা। সাহিত্যমান নিম্ন হলেও এ-উপাখ্যানগুলো পালন করে পুরুষতান্ত্রিক নানা অপধারণা প্রচারের কাজটি। আত্মদান, বিধিলিপি, ভাগ্যচক্র, নিয়তি প্রভৃতি উপাখ্যানে নূরন্নেছা সামাজিক নারীর কর্তব্যই নানাছলে নির্দেশ করেন। তিনি প্রচার করেন নারীর জীবন হচ্ছে পুরুষের কল্যাণের জন্যে, তাই নারীকে নানাভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। কখনো সহোদরের জন্যে আত্মদান করবে নারী, কখনো প্রেমিককে পাবার জন্যে করবে কঠোর তপস্যা, কখনো প্রেমিককে না পেয়ে তিলে তিলে নিজেকে হত্যা করবে সে। সামাজিক উপাখ্যানগুলোতে নূরন্নেছা এসব বিধি প্রচার করেন, আর ঐতিহাসিক উপাখ্যানে তিনি পতিপ্রভুর নির্দেশে মনপ্রাণ ঢেলে দেন অতীতের মুসলমান শাসকের মাহাত্ম্য রচনায়। নূরন্নেছাকে তাঁর পতিপ্রভু এমন 'ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযুক্ত পুস্তক লিখিতে' বলেন যাতে পাওয়া যাবে এ-দেশী মুসলমান শাসকের বীর্য ও কীর্তির বিশদ বিবরণ। অতীত শৌর্যের কথা স্মরণ করে বিংশ শতাব্দীর আদমকুল কতোটা কাতর হতো এ-ব্যাপারটি তারই বিপুল পরিচয় বহন করে। পত্নীর কাজ সহজ করে দেবার জন্যে প্রভু নিজেও নানাভাবে চেষ্টা চালায়। ইংরেজি ও ফারসি ভাষা থেকে বাঙলায় অনুবাদ করে দেয় প্রভু, সংগ্রহ করে দেয় বহু তথ্য। বেগম শুধু প্রভুর নির্দেশে প্রভুর মনমতো বাক্যাবলী রচনা করে চলে। প্রভুর এমন তত্ত্বাবধানে থাকতে পেরে নূরন্নেছা ধন্য হয়ে যান। নিজেকে 'আপনার চরণাশ্রিত দাসী' বলে ঘোষণা করে প্রভুর পায়ে এভাবে লুটিয়ে পড়েন তিনি :

> স্বামীন : আপনার পরিশ্রম ও প্রকৃত সাহায্য ব্যতীত, আমি কোনমতেই এই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে কৃতকার্য হইতাম না: তজ্জন্য আপনার নিকট আমি চির ঋণী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস নামক 'ভাবালুতা স্তূপ' তৈরিতে প্রভুর সাহায্যের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানান নূরন্নেছা এ-অংশটিতে। ওই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা জানায় এ দু'জন মানুষের সম্পর্ক প্রভু ও পরিচারিকার সম্পর্ক ছাড়া কিছু নয়। বশংবদ নূরন্নেছা এখানে লুটিয়ে পড়েছেন এমন দয়াবান মহানুভব পতিপ্রভুর 'চরণাশ্রিতা দাসী' হতে পারার মহাসৌভাগ্য অর্জন করেছেন বলে। তাঁর কাছে নিজের লিখতে পারার সহজাত শক্তি মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রভুর দয়া বা করুণার ব্যাপারটি। তাই এমন ভক্তি ও নিবেদনে লুটিয়ে পড়া নূরন্নেছার। এখনও একই বোধ ও বিশ্বাস দ্বারা একই রকম আবিষ্ট হয়ে আছে বাঙালি মুসলমান নারীকুল। বাঙালি মুসলমান নারী এখনও বিশ্বাস করে এবং কারণে অকারণে জাহির করে যে, সে যে চাকুরি করতে পারছে বা নারী বিনোদিনী হয়ে জনগণের মনোরঞ্জন করছে তা কেবলই প্রভুর কৃপায়। পতিপ্রভু দয়ালু না হলে তার পক্ষে কোনো কিছুই করে ওঠা সম্ভব হতো না। নূরন্নেছা জ্ঞাপন করেছেন যে গদগদ প্রভুভক্তি, ওই মূঢ়তা সমান রূপে বিরাজমান তাঁর এই বর্তমান উত্তরসূরিদের মধ্যে।

বিবিকে কবি করে তোলার সকল বন্দোবস্ত আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করেন সৈয়দা মোতাহেরা বানুর পতিপ্রভু। মোতাহেরা বাল্যকালে বিবাহিত হন এবং প্রায় মুখে মুখেই রচনা করেন ভাবালুতার আকুলি-বিকুলিতে ভরা পদ্য। ওই পদ্য বুদবুদের মতোই মিলিয়ে যেতো, যদি না পতিপ্রভু ওটিকে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির কাজে লাগাবার জন্যে ব্যবহার করতেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের তখন নতুন আদমেরা নিজেদের বিবির প্রতিভা প্রদর্শনের মহা মীনাবাজারের আয়োজন করেছিলেন। ওই মীনাবাজারের বিবিকুল রচিত সাহিত্যকর্ম নামক হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ক্ষেত্র। ওই মীনাবাজারে প্রতি প্রভুই নিজের বিবির হস্তশিল্প প্রদর্শনের জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং প্রদর্শনীতে প্রতিভার নমুনা না পাঠাতে পারলে জীবন নিরর্থক হয়ে যেতে থাকে তাদের। তাই মোতাহেরা বাল্যবান্ধবীর বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে যে পদ্যটি লিখে ফেলে, প্রভু তা নিয়েই ছোটে কলকাতায় এবং মুদ্রণের বন্দোবস্ত সম্পন্ন করে। দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ ওই প্রভুরা এভাবে কী সহজ করে তোলে নারীর লেখক হওয়া! যে একটি পঙক্তিও নির্ভুল লিখতে পারে না সে দেখা দেয় কবি হয়ে। আর সে এতো বাহবা পেতে থাকে যে মধ্যবিত্ত স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীদের প্রায় সকলেরই চিত্ত লুব্ধ হয়ে ওই অনায়াসে সিদ্ধি লাভের জন্যে।

এইসব পদ্য আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়। বাঙলা সাহিত্যে এগুলোর কোনো মূল্য নেই বা এগুলো না লেখা হলে বাঙলা সাহিত্য রুদ্ধগতি হয়ে যেতো না। বরং এই আবর্জনার ভারই তার গতি রুদ্ধ করে তুলেছে। তবে এই সহজে সিদ্ধির ব্যাপারটিও

পরবর্তী বাঙালি মুসলমান নারীকে দুশ্চরিত্র হবার জন্যে বড়ো উদ্দীপকের কাজ করেছে। ওই সময় যে শুধু স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভারাই ছিলো এমন নয়। ওই স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভাদের অন্তঃসারশূন্য যশ ও মিথ্যে প্রসিদ্ধি দেখে ব্যাকুল হয়ে পদ্য ও গদ্য রচনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আরো বহু বেগম। তাঁরা ঠিক পতির আনুকূল্যে বিকাশ লাভ করে নি, তাঁরা বিকশিত হতে এগিয়ে আসে নিজের আবেগে। তবে ওই আবেগ বা উদ্দীপনা তাঁদের মধ্যে জাগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নয়, পুরুষতন্ত্রেরই ফুসলানিতে। এমন দুজন 'প্রতিভা' হচ্ছেন মিসেস এম. রহমান ও মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা।

মিসেস এম রহমানকে তাঁর সময়ের নতুন আদম অভিহিত করেছে 'অগ্নিকন্যা' নামে, তবে খুব সযতনে মুছে দিয়েছে এই অগ্নিকন্যর নিজের নামটি। মিসেস এম. রহমানের প্রকৃত নাম এখন লুপ্ত, আর তার গদ্যে যে আগুন ঝরেছে বলে তাঁর সময়ের 'প্রগতিপন্থী' নতুন আদম রটনা করে; তা আগুন নয়, আগুনের প্রতিভাস। মিসেস এম. রহমান ফেনানো ভাষায় ভাবালুতায় আপ্লুত কণ্ঠে চান বাঙালি মুসলমান নারীর ইসলামী মুক্তি; যে রকম মুক্তি ওই সময়ের নতুন আদম তাঁর বিবিকে দিতে চেয়েছিল বলে 'কাঠমোল্লা' দের সঙ্গে বিবাদ বেঁধেছিল। তবে ওই 'প্রগতিপন্থী' নতুন আদমের সুরে সুর মিলিয়ে তাদের পরিতুষ্ট করার ফল এই নারী নগদ নগদই লাভ করেন। লাভ করেন নতুন আদমের অঢেল স্তুতি, যা নিরর্থক। পুরুষতন্ত্র সর্বদাই তার বশংবদদের স্তুতি করায় অকুণ্ঠ। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার পিতা উচ্চপদস্থ হবার কারণে তার লেখাপড়া শেখার ও উচ্চশিক্ষিত হবার সুযোগ ছিলো প্রচুর। কিন্তু ওই পথে না গিয়ে সামান্য লেখাপড়া করেই নিজেকে মীনাবাজারে পাঠাতে তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি। তার সুযোগ ছিলো মানুষ হয়ে ওঠার; কিন্তু তিনি সানন্দে বেছে নেন পরগাছা হবার পথ। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের বর্ণনা থেকে জানা যায় তাঁর জীবনের ওই অবস্থার কথা :

> ১৩৩৭ সালে হঠাৎ করে একদিন তিনি ১১নং ওয়েলেসলী স্ট্রীটে অবস্থিত' সওগাত' কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। সমাজের সেই অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে মুসলিম নারীরা যখন অবরোধের কঠোর প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময় এই তরুণীকে দেখলাম আধুনিক পোশাকে সজ্জিতা হয়ে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে। আশ্চর্যের বিষয়, তার মাথায় চুলগুলিও ছিল 'বব' কাটা।

তবে ওই সবই ছিলো খোলস মাত্র। তাঁর পিতার আনুকূল্য ছিলো বলে এবং নিজের কাছে এমন হওয়া খুব গৌরবজনক বলে মনে হয়েছে বলেই মাহমুদা অমন পোশাকআশাক ব্যবহার করেছেন। অন্ধকার থেকে মুক্ত হবার জন্যে এমন করেছেন তা নয়। অন্য বিবিদের লেখা ও ছবি মুদ্রিত হতে দেখে অমন প্রসিদ্ধি পাবার জন্যে

তাঁর মন তড়পাতে থাকে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্যোগ নেন তিনি। পদ্য রচয়িতা হিশেবে তাঁকে এ-বঙ্গে স্মরণ করা হলেও তাঁর পদ্যের সাহিত্যমূল্য শূন্য।

৩. সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামাল দেখা দেন পদ্যকার হিশেবে। তবে পদ্যকার হিশেবে সুফিয়া কামাল গৌণ; কিন্তু তিনি পরগাছার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর পদ্য রবীন্দ্রনাথের অতি দুর্বল নকল, তারপরেও তিনি কবি প্রসিদ্ধি পান, তাঁর পতিপ্রভু ও ওই সময়ের নব্য আদমগোত্র তাঁকে কবি করে তোলার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে বলেই এমনটি সম্ভব হয়। বিবাহ ও পতিপ্রভু এই নারীগোত্রের জন্যে কতোটা জরুরি সুফিয়ার জীবন তা বিশদভাবে জ্ঞাপন করে। এখন যারা পতিবৃক্ষের শাখায় রসালো পরগাছা হয়ে গর্বে ও গৌরবে ডগমগ, সুফিয়া তাদের পূর্বসূরি। তিনি জীবনে একবার দৈব অনুগ্রহে পান স্বাবলম্বী মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ, যা রোকেয়াও কখনো পান নি; কিন্তু ওই অবস্থাটি সুফিয়ার কাছে গণ্য হয় শিরে বজ্রাঘাত রূপে। তাই নিজের পায়ে দাঁড়াবার কঠোর দায়ভার বহনের চাপ তাঁকে অসুস্থ করে তোলে; তিনি শোকে কাতর হতে হতে মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। তবে পুনর্বার পরাশ্রিত হবার সুযোগ পাওয়া মাত্র আবার ঝালমলিয়ে ওঠে তাঁর দেহমন।

সুফিয়া দু'বার বিবাহিত হন। তাঁর প্রথম স্বামীর নাম সৈয়দ নেহাল হোসেন। সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যুর পর সুফিয়ার বিবাহ সম্পন্ন হয় কামালউদ্দীনের সঙ্গে। প্রথমবার সুফিয়ার বিয়ে হয় বারো বছর বয়সে। তাঁর মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। সুফিয়া কিশোর বয়সেই পান ইংরেজিশিক্ষিত পতি সৈয়দ নেহাল হোসেনকে, যে 'নানা বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা এনে দিয়ে সুফিয়ার শিক্ষা ও লেখার প্রেরণা যোগাতে' থাকে। নেহাল হোসেন সায়েস্তাবাদের নবাব পরিবারের পুত্র। সুফিয়ার সঙ্গে বিবাহের কালে তিনি কলকাতায় আইন অধ্যয়নরত ছিলেন। ক্রমে অন্য সকল নব্যআদমের মতো সুফিয়ার স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনও সপরিবারে কলকাতাবাসী হয়ে ওঠেন আর জীবনযাপনে নিজের প্রগতিশীলতা জাহিরের জন্যে অন্যদের মতো হয়ে থাকেন তৎপর। কলকাতাবাসী সুফিয়া দিন কাটে পতিপ্রভুর দেয়া সচ্ছলতার মধ্যে ঘর গেরস্থালী সামাল দিয়ে, স্বামীর সেবা ও সন্তানের পরিচর্যা করে, আর অবকাশমতো নানা রকম পদ্য রচনা করে। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সুফিয়ার ওই সময়ের এমন বিবরণ দেন :

> সুফিয়া একান্তই সুগৃহিণী। সংসারের কাজ, রান্নাবান্না, সেলাই আর পরিবারের সকলের খাওয়া-দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন বেশির ভাগ সময়।

আর বাকি সামান্য সময়টুকু আপন মনের খেয়ালে বয়ন করে চলে পদ্যকর্ম। পতিপ্রভু বিবির ওই প্রতিভার সন্ধান পেয়ে চমৎকৃত হয়ে যান এবং নিজে হয়ে ওঠেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সৈয়দ নেহাল হোসেন শুধু সুফিয়ার 'কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ' হয়ে 'কবিতা লেখার জন্যে নানাভাবে তাঁকে উৎসাহ' দিয়ে থেমে থাকেন না, বিবির 'বিকাশের' সকল পথ নির্বিঘ্ন করায়ও তৎপর হন। অবশ্যই ওই বিকাশ প্রভুর তৈরি করে দেয়া ছকের মধ্য দিয়ে ঘটা বিকাশ। পরগাছার বিস্তার যতো বিশালই হোক তাতে যেমন তার অবস্থার কোনো বদল ঘটে না, তেমনি পতিনির্ভর এই বিবিকুলের প্রভুগোত্রের ছাঁচমতো বিকশিত হয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করাও তাদের মানব জন্মের জন্যে উপকারী কোনো ব্যাপার নয়। কারণ ওই সব সুখ্যাতি তাদের বিভ্রান্ত করে রাখারই নতুন রকম পুরুষতান্ত্রিক চক্রান্ত। তাতে তাদের অসহায় পরজীবী অবস্থা ঘোচে না, বরং পরজীবী থাকতে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করার জন্যে তাদের দেয়া হয় নিরর্থক প্রসিদ্ধি। সুফিয়ার ক্ষেত্রেও এমনিই ঘটেছে।

নেহাল হোসেনও অন্যান্য নতুন আদমের মতোই বিবির প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগটিকে লুফে নেন। নিজেকে অগ্রসর প্রগতিশীল হিশেবে জাহির করার আবেগ এ- আদমের প্রবল, তাই বিবিকে নানাভাবে ঠেলে দেন তিনি ওই সময়ে 'প্রগতিশীলতা' রূপে চিহ্নিত সকল কাজে। বিবিকে মুক্ত করেন বোরকার ঘেরটোপ থেকে। কলকাতাবাসী নবাববংশের কুলবধূ সুফিয়া 'স্বামী নেহাল হোসেনের বলিষ্ঠ সমর্থন' পেয়ে 'ক্রমে বোরখা সম্পূর্ণ ত্যাগ করলেন', প্রভুর 'উদারতার গুণে সওগাত অফিসে আসা-যাওয়া এবং লেখা দেওয়া সুফিয়ার জন্যে বাধাহীন হয়ে' উঠলো। এ-প্রভু শুধু বিবিকে 'পর্দার অন্তরাল' থেকে বার করে আনেন নি, 'প্রগতিবিরোধী' গোঁড়াদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিবির ছবি সওগাতে প্রকাশের অনুমতি দেন। এমনকী পত্নীকে দেন অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা। এ-নতুন আদম এতোই উদার যে বিবিকে বিদেশী পাইলটের সঙ্গে বিমান ভ্রমণে যাবার অনুমতি দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। 'স্বামীর সমর্থন' পেয়ে সুফিয়া তাই ১৯২৯ সনের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আকাশে উড়লেন। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ওই নতুন আদমের ঔদার্যের এমন স্তব করেন :

> মনে মনে ভাবলাম এই সেদিনও যে সুফিয়া বোরখা ছাড়া চলতেন না, পর্দার অন্তরালে থাকতেন- স্বামীর ঔদার্য ও প্রগিতশীল মনোভাবের গুণে আজ তিনি গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের বন্ধন মুক্ত কবি মানসের অধিকারী, এমনকি পত্রিকায় তাঁর ছবি দিতেও তার আপত্তি নাই।

এ-ভাবে সুফিয়া প্রভু অনুগ্রহে 'অগ্রসর' জীবনযাপন করা শুরু করেন। তবে এ 'অগ্রসর' জীবন হচ্ছে বৃক্ষের শাখায় লতানো স্বর্ণলতার জীবন। বৃক্ষ ভূপাতিত হলে

যার শোভা সৌন্দর্য ও অস্তিত্ব সকলই শূন্য হয়ে যায়। নেহাল হোসেন এ-ভাবে বিবি সুফিয়ার জন্যে ওই জীবনেরই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। আর সুফিয়াও নিজের এমন অবস্থাকেই স্বাভাবিক ও ঐশ্বরিক বলে বিশ্বাস করে পরিতোষের সঙ্গে জীবনযাপন করে চলেন।

সুফিয়া খুব সহজেই কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সুফিয়ার স্বামীর অনুমতি নিয়ে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সওগাতে ছাপিয়ে চলেন সুফিয়ার নানা নায়িকাভঙ্গীর ছবি। সুফিয়ার পদ্য নয়, তাঁর ওই নবীন বয়সের নায়িকামার্কা ছবিগুলোই তাঁকে প্রসিদ্ধ করেছে। তাঁর পদ্য জবজবে ভাবালুতায় জড়ানো, 'আঁকাবাঁকা অক্ষরে' লেখা আহা উহু আর দক্ষিণা বাতাসের দুষ্টুমির কথা ছাড়া আর কিছু নয় ওই পদ্য। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন জানান সুফিয়া তাঁর 'প্রতিভা বিকাশের' প্রথম দিকে এমনকী 'কবিতার নামও দিতেন না', কিন্তু তারপরেও আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কবি হিশেবে সুফিয়ার নাম সহজেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 'ছড়িয়ে পড়ে; কারণ প্রভুকুল ছড়িয়ে দেয়। 'ছড়িয়ে পড়ে কারণ তাঁর ছবিগুলো তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ার জন্যে বড়ো ভূমিকা পালন করে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন যদিও সুফিয়ার প্রসিদ্ধি পাওয়ার এমন কারণ নির্দেশ করেন, 'প্রকৃতপক্ষে তখন মুসলমানদের আধুনিক ধরনের একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা সওগাতের প্রচার সংখ্যা খুব বেশি ছিল বলেই কবি হিশেবে সুফিয়ার নাম সহজে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।' সওগাতের প্রচার সংখ্যা বেশি ছিলো বলে বহু ঘরে সহজেই পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয় তরুণী সুফিয়ার রূপের সংবাদ এবং সহজ হয়ে ওঠে পরিচিতি লাভ। আবির্ভাবকালীন একটি পদ্য উদ্ধৃত করে দেখা যেতে পারে এই প্রতিভার ওই সময়ের সৃষ্টিশীলতার নমুনা :

দক্ষিণ হাওয়া করত খেলা
নিয়ে তোমার চূর্ণ অলক
মুগ্ধ আমি রইতুম চেয়ে
পড়ত না মোর আঁখির পলক।
তোমার সাথে মোর পরিচয়
আশ্বিনেতে শরৎ- শেষে
অনুরাগের রাঙা আবীর
ছড়িয়ে দিল ফাগুন এসে।

এখানে কিছু ছেদো কথাকে আহাউহু দিয়ে জড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় নি। যদিও এতে নেই ছন্দের ভারসাম্য, নেই আন্তরিক আবেগের কিছুমাত্র স্পর্শ, তবুও এর রচয়িতা খুব অনায়াসেই কবিখ্যাতি পেয়ে যায়। প্রতিভাগুণে যে এই পদ্যকার এই প্রসিদ্ধি পায় এমন নয়, প্রভুকুল তাঁকে এমন প্রসিদ্ধি দেয়ার

সিদ্ধান্ত নেয় বলেই এই অতি নিম্নমানের স্বভাব পদ্যকার অমন প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথম জীবনে যেমন সুফিয়া দখিনা হওয়া, চূর্ণ অলক, রাঙা আবীর, হংস বলাকা, ঝরা শেফালী নিয়ে কাঁদুনি গেয়েছেন, পরে পরিণত জীবনে কেবলই ঘুরেফিরে গান গেয়েছেন ঈদের খুশীর, কায়েদে আযমের মাহাত্ম্য বা আজাদীর মহিমার। এখনো তাঁর অমন ঈদের চাঁদ, সিয়ামের সংযম নিয়ে পদ্য বাধার কাজ অব্যাহত আছে। তাঁর প্রায় একটি পংক্তিও কখনোই কবিতা হয়ে ওঠে নি। এমনকী একটি সরল মধুর পদ্য পংক্তিও লিখতে শোচনীয় রূপে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

সুফিয়ার কবিখ্যাতি লাভ ও কবি হয়ে ওঠার পেছনো ছিলো নব্য আদম গোত্রের প্রবল আনুকূল্য আর পতিপ্রভুর প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা। ওই সময়ের নব্য আদমকুলের চিত্তের চাহিদা পূরণের বড়ো উপকরণ রূপে ব্যবহার করা হয় সুফিয়াকে। নতুন আদমকুল বহুকিছু পেয়েও অতৃপ্ত ছিলো, কারণ তাঁদের গোত্রের কোনো 'মহিলা কবি' ছিলো না। সওগাত 'মুসলিম মহিলাদের' লেখা ছাপার ঢালাও ব্যবস্থা করেও ওই সময় 'মুসলিম মহিলাদের কাছ থেকে আশানুরূপ লেখা' পায় না এবং সওগাত সম্পাদকসহ অন্য নতুন আদমেরা 'অনেকটা নিরাশ' হয়ে পড়ে। ওই সময় সওগাতে এসে পৌঁছে সুফিয়ার পদ্য। যদিও তা ছিলো অল্প বর্ণপরিচয়সম্পন্ন 'স্বভাব কবি'র 'সহজ সরল' তরল ভাবালুতা; যে 'ভাবালুতা' কে ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করাও পদ্যকারের পক্ষে কঠিন ছিলো। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ওই পদ্যের 'কোথাও দাঁড়ি-কমা' ছিলো না, হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরের লেখা পাঠোদ্ধার করাও ছিল কষ্টকর', আর 'কবিতাটির কোনো নামও' লেখক দিতে পারেন নি, তবু এই রচনাটি নতুন আদমদের মনে 'আশার সঞ্চার' করে, তাঁরা নিজেদের 'একজন নতুন কবির আবির্ভাব দেখে' শিহরিত হয়ে ওঠেন। সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন 'অত্যন্ত আগ্রহের সাথে' লেখা প্রকাশ করতে থাকেন আর সওগাত অফিসের বিকেলের মজলিসে সকলে মেতে ওঠেন ওই নতুনের প্রশংসা রচনায়। সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন যেহেতু ওই 'কবির' পদ্যের খাতা যোগাড় করেন, তাই তিনি নিজে নেন আবিষ্কারকের গৌরব।

> তখন আমি উৎসাহের সাথে সকলকে অবাক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুফিয়ার কবিতার খাতাটি মজলিশে পেশ করলাম। বল্লাম : আমাদের নাকি মহিলা কবি নেই, এই দেখুন নতুন কবির সন্ধান পেয়েছি।

সকলে তখন সমস্বরে এই নবীনার প্রশংসায় মেতে ওঠে, আর সুফিয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখেই বাঙালি মুসলমানদের মহিলা কবি হয়ে ওঠেন। সুফিয়ার পতিপ্রভু নেহাল হোসেন বিবির নানামুখী বিকাশের জন্যে আরো জোর তৎপরতা চালান। বিবিকে বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব 'মহিলা কবি' করার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেই তিনি ক্ষান্ত হয় না। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সকল পথেই তিনি ঠেলে

দেন বিবিকে। বিবি পদ্য রচনা করে প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতায়, সংসার গোছায় প্রভুর নির্দেশমতো, আবার সমাজকল্যাণের কাজেও যোগ দেয় প্রভুর হুকুম মতোই। এ-ভাবে বিবিকে নেত্রী করে তুলে প্রভু আস্বাদ করে নিজেরই শক্তি ও শৌর্যকে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের বর্ণনা থেকে জানা যায়-

> অবরোধবাসিনী সুফিয়ার মনের জড়তা কেটে গেছে। পারিবারিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর স্বামী তাঁকে প্রগতিমূলক সর্বকাজে সহায়তা করলেন। ফলে সাহিত্যকর্ম ছাড়াও তিনি নেতৃস্থানীয় মহিলাদের সাথে সামাজিক কাজে যোগদান করলেন।

এভাবে প্রভুর নির্দেশমতো চালিত হয়ে প্রভুকে গৌরবশালী করে তুলতে পেরে অন্য বিবিদের মতোই এ-বিবিও ধন্য হয়ে যান। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের বিবরণ অনুসারে 'কাব্যচর্চা ও সুখী পারিবারিক জীবন এই উভয় আনন্দের মধ্যে' এ-বেগমের 'দিনগুলি বেশ' কাটতে থাকে। তবে অচিরেই দেখা দেয় 'এক নিদারুণ বিষাদের ছায়া'। নেহাল হোসেন ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘদিন রোগে ভুগে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু বৃক্ষই ভূপাতিত তাই বৃক্ষাশ্রিতের জীবনও গভীরভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। তবে এই প্রভু অকালে মৃত্যুবরণ করেন বলে রোকেয়ার পতিপ্রভুর মতো কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে যাবার সুযোগ পান নি। সুফিয়ার জন্যে তিনিও রোকেয়ার মতো কোনো কঠোর সাধনার পথ তৈরি করে রেখে যেতে পারেন নি। যেহেতু রসদ জোগানদারই মৃত তাই নির্ভরশীলের সকল জৌলুষ অচিরেই মিইয়ে যায় বরং তাঁর ওপর আসে আরেক মহাচাপ। পরজীবীকে অবস্থা বিপর্যয়ের কারণে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উদ্যোগ নিতে হয়। আর তখন এই লতানো উদ্ভিদের কাছে জগৎ সংসার ও তার নিরর্থক সৃষ্টিশীলতা মিথ্যে ও নিরর্থক বলে মনে হতে থাকে। যেহেতু তাঁর ডগমগ হয়ে থাকার মাচাটিই বিধ্বস্ত তাই এই উদ্ভিদের কাছে সবকিছুই এমন নিরর্থক। প্রভুকে হারিয়ে তাই প্রভুবিরহিনীর এমন আহাজারি :

> অন্তরের অন্তস্থলে গুঞ্জরে ক্রন্দন
> লুটায়ে পড়িতে চায় অন্তরের সর্বহারা জন
> উৎসবের আগমনের মরিছে কাঁদিয়া
> একাকিনী মোর দগ্ধ হিয়া।
> ধরণী সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ শ্যাম প্রদীপ্ত গগণ,
> আনন্দ বন্দনা গানে মুখরিত চঞ্চল পবন
> ধরণীর সাথে নভ; বারিধির সখা যে সমীর
> মোর গৃহ শূন্য শুধু, কেহ নাই মুছাইতে নীর
> তবে কেন আমার সৃজন ?
> পূর্ণ করি অকারণে ধরণীর ক্ষুদ্র এক কোণ?

অশ্রু 'মুছাইতে' 'কেহ নাই' বলে এখন 'সৃজন'ও অর্থহীন বিরহিনীর কাছে। 'সৃজন' শুধু প্রভুর মনোরঞ্জনের কাজ ছিলো বলেই এমন বোধ জেগে ওঠে। পতিধন না থাকলে যে নারী অভাগিনীর কিছুই থাকে না। পতিপ্রভুর মৃত্যুতে তাই সুফিয়ার কাছে সকলই নিরর্থক। জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে ওঠার কারণে অগত্যা সুফিয়াকে 'নিজের পায়ে দাঁড়াবার' ব্যবস্থা করতে হয়। তিনি 'কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলে একটি চাকুরি' নিয়ে শুরু করেন নিজের জীবন নিজে চালাবার সবচেয়ে কঠিন কাজটি; কিন্তু 'আদরে লালিত-পালিত উচ্চবংশের কুলবধূ' কে যখনই 'ভাগ্যের দোষে' স্বাবলম্বী জীবনযাপন শুরু করতে হলো, তখনই দেখা দিল তাঁর জীবনে মহাবিপর্যয়। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের বিবরণ থেকে জানা যায়, 'সুফিয়া ক্রমে ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার শরীর ভেঙ্গে পড়ল। তিনি রোগশয্যা গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল। কোনো চিকিৎসায়ই ফল হলো না।' এই কুলবধূ অসুস্থ হয়ে ওঠে নিজের বেঁচে থাকার অর্থ তাঁকে নিজেকে উপার্জন করতে হয় বলে। ওই কুলবধূ মরণাপন্ন হয়ে ওঠে নিজের দায়িত্ব নিজেকে বহন করতে হয় বলে। স্বাবলম্বী জীবনের দায়ভার বহনের জন্যে তাঁর জন্ম হয়েছে এমন বিশ্বাস সে কখনো পোষণ করে নি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে কর্মজীবী হতে হয় বলে তার জীবন এখন তাঁর কাছে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, আবার এ-জীবনে পতিপ্রভুর দেয়া সচ্ছলতা না থাকার কারণেও জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। উচ্চশিক্ষিত কৌশুলি পতি নেহাল হোসেন তাঁকে শুধু পদ্য রচনারই পৃষ্ঠপোষকতা দেয় নি, দিয়েছে সচ্ছলতা ও ভাবনাহীন বাকবাকুম করে যাওয়ার পরিবেশ। ওই স্বর্গ থেকে বহিস্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় তাঁর সকল চাকচিক্য। এমনকী মুমূর্ষু হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু পুনর্বার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেঁচে ওঠেন। গৃহবধূর জীবন ফিরে পেয়ে আবার ঝলমলিয়ে ওঠেন ও পদ্য জঞ্জাল তৈরি করা শুরু করেন আরো বেশি করে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন জানান, হিতৈষীজনদের প্রচেষ্টায় যখন 'সদ্বংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, প্রগতিবাদী, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান জনাব কামালউদ্দিন খান এম. এস. সি'র সাথে সুফিয়ার বিয়ে হয়, তখন দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন তিনি। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন জানিয়েছেন-

> সুফিয়া জীবনের দারুণ সংকটকালে মিজানুর রহমান সাহেবের উদ্যোগে ১৯৩৯ সনের ৮ই এপ্রিল কামাল উদ্দীন সাহেবের সাথে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যেই সুফিয়া সুস্থ হয়ে ওঠেন।

লতা পুনর্বার সতেজ হয়ে ওঠে কারণ সকল বাস্তব দায়দায়িত্ব বহনের শক্তপোক্ত বৃক্ষ জুটে যায় তার। নারীর এমন অবস্থার চেয়ে শোচনীয় ও লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বাঙালি মুসলমান নারী এমন পরগাছা হতে চাওয়া

ছাড়া আর কিছুই হতে চায় না। তারা নির্ভরশীল থাকতে চায় কারণ তাতে বড়োই সহজে নারীজন্ম কাটিয়ে দেয়া যায়। উপার্জন করা ও নিজেকে স্বাবলম্বী করে জীবন কাটানো হচ্ছে মানবজন্মের সবচেয়ে কঠিন কাজ। পরগাছারা তা চায় না। তারা চায় আরামে শোভা পেতে, তার জন্যে যে- রূপে তাদের থাকতে বলে তাদের প্রভুরা, তারা দ্বিধাহীনভাবে ওই রূপ বরণ করে। সুফিয়ার জীবন হচ্ছে ওই অবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিতীয় স্বামী কামালউদ্দীনের ওপর লতিয়ে যেতে পেরেই বেগম আবার লকলকিয়ে ওঠেন। নাসির উদ্দিন জানান, 'সুফিয়া অতীতের দুঃখকষ্ট ক্রমে ভুলতে লাগলেন। কামাল সাহেব তাঁর কবি প্রতিভার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন। গড়ে উঠল সুফিয়ার এক নূতন জীবন।' আর পুনর্বার ঝলমলিয়ে শোভা পাবার সুযোগ পেয়ে সুফিয়া এ-ভাবে মুখর হয়ে ওঠেন :

> সুন্দরের দান-
> লভিলাম! জন্ম ভরি রহিবে অম্লান।
> দুর্ব্বহ দিবস রাত্রি ছিল মোর হল সহনীয়
> হল সে পরম রম্য, তোমারে লভিয়া মোর প্রিয়
> আমিও রহিনু বাঁচি, পাইলাম নবীন জীবন
> সুন্দরের স্পর্শ লভি! স্মরিতে জাগিছে শিহরণ!
> সুন্দর! সেদিনও মোর রাত্রি ছিল নিঃসঙ্গ একেলা,
> স্বপ্নশূন্য নিদ্রাহীন, শূন্যতার অসহ সে জ্বালা!
> এলে বন্ধু তুমি-
> অলক্ষ্য গোপন পায়ে, এ বিদগ্ধ তপ্ত ভাল চুমি ?
> আজিকার নিশীতের নিদ্রাহীন সুদীর্ঘ প্রহর
> শূন্য ব্যথাময় নহে, তব স্বপ্নে পূর্ণ মনোহর।

'সতীর সর্বস্ব পতি'-এ পুরুষতান্ত্রিক রটনাটির সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন সুফিয়া। ওপরে তাঁর যে দু'টি পদ্যাংশ উদ্ধৃত হয়েছে, তা ধারণ করে আছে এই নারীর পতিপ্রাণতার খোলামেলা পরিচয়। উদ্ধৃত স্তবক দু'টির প্রথমটিতে পাওয়া যায় পতিহীনার কাতর রোদন। পতি নেই বলে ওই নারী নিজেকে সর্বহারা বলে মনে করেছে। তাঁর গৃহ শূন্য কারণ তার পতি মৃত। উৎসবের আনন্দদিন তাঁকে সুখী না করে আরো দুঃখভারাক্রান্ত করেছে, কারণ সে পতিহীনা একাকিনী। চোখের জল ফেলেও এখন সুখ নেই, কারণ ওই জল মুছে দেয়ার পুরুষটি এখন মৃত। এ-অংশটি বিগত সুখের জন্যে কাতরতায় ভরা আর মৃত পতির জন্যে অশ্রুপাতে ভেজা। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাংশটিতে পাওয়া যায় পুলকে বিহ্বল আর তৃপ্ত নারীর অস্ফুট কাকলি। ওই নারী পরিতৃপ্ত, কারণ ওই নারী একা থাকার 'স্বপ্নশূন্য নিদ্রাহীন

শূন্যতার জ্বালা' থেকে মুক্তি পেয়েছে। পেয়েছে 'প্রিয়, সুন্দর' পতিপ্রভু। পতিপ্রভুকে পেয়েছে বলে তার 'দুর্ব্বহ' জীবন এখন 'পরম রম্য' হয়ে উঠেছে। তাঁর রাত্রির শয্যা এখন সুখময়। 'নিশীথের নিদ্রাহীন সুদীর্ঘ প্রহর' এখন আর তাঁর শোকে দীর্ঘশ্বাসে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটে না, বরং 'প্রিয় সুন্দরের' সান্নিধ্যে ওই প্রহরগুলো এখন হয়ে উঠেছে স্বপ্ন পান করার কাল। পতি আছে বলেই নারী এখন এমন মুখর, এমন ঝলমলে।

বিবাহ দূষণীয় কিছু নয়; কিন্তু বিবাহকেই নারীজীবনের সর্বস্ব বলে গণ্য করার চেয়ে নারীর জন্যে ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না। ঘৃণ্য হচ্ছে পরজীবী হতে পেরে বর্তে যাওয়ার মানসিকতা। ওই মানসিকতার কারণেই বিবাহিত জীবন ফিরে পেয়ে সুফিয়া এমন নবজন্ম লাভ করেন। তাঁর মনে হতে থাকে 'আজিকার বসন্ত প্রভাত/ প্রথম প্রভাত মনে হয়/...লভিয়ে পরশ তব আমার ভুবন হলো সুন্দর মধুর'।

সুফিয়া নিজের নামের মধ্য দিয়েও স্পষ্ট করে তোলেন নারীর পতিসর্বস্বতাকে। প্রথম জীবনে যখন তিনি নেহাল হোসেনের পত্নী ছিলেন, তখন সুফিয়া এন হোসেন নামে পদ্য লিখতেন। আবার কামালউদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ হবার পর তিনি নিজেকে হাজির করেন সুফিয়া কামাল রূপে। পতিকে অবলম্বন করে শুধু সংসারে ঝলমলিয়ে উঠলেই পতিসর্বস্বের চলে না, তাঁকে নির্ভর করতে হয় প্রভুর নামের ওপরও। তবেই সম্পূর্ণ হয় তাঁর পরজীবী হয়ে ওঠা। সুফিয়াও বারংবার নানা প্রভুর নামে সঙ্গে নিজেকে সগৌরবে যুক্ত করে জাহির করেছেন নিজের অবস্থা। পুরুষতন্ত্র সুফিয়াকে পদ্যরচয়িতা হিশেবে প্রসিদ্ধি পাবার পথ করে দেয় এবং ওই প্রসিদ্ধি যাতে অটুট থাকে তার বন্দোবস্তও সম্পন্ন করে। তাই এখনও নীরক্ত এ- পদ্যকারকে নিয়ে চলে মাতামাতি। ওই পদ্যগুলো রচিত না হলে বঙ্গ সাহিত্যের মহাসর্বনাশ হয়ে যেতো না। পদ্যকার হিশেবে সুফিয়া অনুল্লেখ্য, আর তাঁর জীবন পরাশ্রিতের বিকাশ ও বিস্তারের দৃষ্টান্ত। সুফিয়া যদি স্বাবলম্বী জীবন যাপন করতেন তবে তাঁর জীবন হতো বাঙালি মুসলমান নারীর জন্যে অনুসরণীয়। কেন না অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের পথ দিয়েই শুধুমাত্র নারীর মুক্তি সম্ভব। পরাশ্রিত সুফিয়াকে অনুসরণ করে শুধু অনড় করে তোলা চলে জীবনের অন্ধকার। পদ্যকার সুফিয়াকে অনুসরণ করে পদ্যের আবর্জনা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ- বঙ্গে সুফিয়ার অনুসারীর সংখ্যা প্রচুর; যাঁরা স্বর্ণলতা হতে পেরে ধন্য, অসাহিত্যের আবর্জনা তৈরিতে অক্লান্ত।

আধুনিকা স্ত্রী : আকিমুন্নেসা আহমদের কামসূত্র

এ-ভূখণ্ডে পুরুষতন্ত্র এখন বিশালকায়, বিকট, অবয়বহীন, শিথিল ও নেতিয়ে পড়ে থাকা দানব ছাড়া কিছু নয়। সে এখন আর নিজে কাজ করতে পারে না। এককালে সে নিজে তার সেনাপতি ও পারিষদদের নির্দেশ দিতো, এখন নিজেই বয়সের ভারে ন্যুব্জ আর অথর্ব সে। কিন্তু সে জীবিত। এবং এভাবেই সে বেঁচে থাকবে যতোদিন না তাকে সচেতনভাবে কেটে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হবে। একমাত্র নারীই তাকে কেটে ফালাফালা করতে পারে। কিন্তু নারী তলিয়ে আছে কালঘুমে। পুরুষতন্ত্রই শুধু তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে এমন নয়, সে ঘুমিয়ে আছে অনেকখানি পুরুষতন্ত্রের মন্ত্রে, বেশ কিছুটা স্বেচ্ছায়। তার জাগরণ ঘটা সুদূরপরাহত, কারণ সে নিজে খুব সাবধানে বহাল রাখছে তার ওই অবস্থা। বরং যে তাকে জেগে ওঠার জন্যে নাড়া দেয়, নারী ক্ষিপ্ত হয় তার ওপর। ক্যালিবান শুধু আয়না ছুঁড়ে ফেলে আর আর্তনাদ করে ক্ষান্ত হয়েছিলো- এই নারীকুল শুধু সামনে তুলে ধরা আয়না ছুঁড়ে ফেলেই ক্ষান্ত হয় না। অন্ধ আক্রোশে আক্রমণ করে তার পরম মিত্রকে। যে আয়না তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ হয়। প্রকৃত মিত্রকে তারা মহাশত্রু ভাবে। পুরুষতন্ত্রের দীক্ষা তাদের মধ্যে শেকড় গেঁড়েছে এমনই প্রবলভাবে। এই নারীকুল এখন পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে পালন করে চলেছে শিথিল ও অবয়বহীন পুরুষতন্ত্রের অতিবাধ্য গোমস্তার ভূমিকা।

পুরুষতন্ত্র এখন চিৎপাত পড়ে থাকা দানব বটে, এখন আর তার পরাক্রান্ত রাজা সেনাপতিরাও নেই ঠিকই, কিন্তু আছে নানা মাপের অসংখ্য পেয়াদা, গোমস্তা, অনুচর। তারা খরদৃষ্টি ছড়িয়ে রাখে প্রতি কোণে, আনাচে-কানাচে, সর্বত্র। নতুন করে জারি করে পুরোনো অনুশাসন আর কেবলই সিজিল মিছিল করে রাখে পুরোনো সকল প্রথা। ওই গোমস্তারা নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে। কখনো দেখা দেয় হিতার্থী পরামর্শদাতা ছদ্মবেশে, কখনো টহল দিয়ে বেড়ায় 'মোরাল ইন্সপেক্টরের' ভূমিকায়। এমন এক গোমস্তা হচ্ছেন আকিকুন্নেসা আহমদ। তিনি দেখা দেন হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শদাতার ছদ্মবেশে। পরামর্শের ছলে তিনি বাঙালি মুসলমান নারীকে শোনাতে থাকেন পতিপ্রভুর জন্যে কামবিনোদিনী হয়ে ওঠার উপকারিতা।

তাঁর গ্রন্থের নাম আধুনিকা স্ত্রী। এ-গ্রন্থে 'আধুনিক' বাঙালি মুসলমান নারীকে শেখানো হয় কামসূত্র, যে সূত্র ভালোভাবে শিখলেই শুধুমাত্র 'আধুনিকা স্ত্রী' হওয়া সম্ভব বলে জানান তিনি। মোহাম্মদ নজিবর রহমান ফুসলানি দিয়েছিলেন দাসী হতে, আর দু'দশক পর আকিকুন্নেসা ফুসলানি দেন রসবতী বিনোদিনী হতে। নজিবর রহমানের গ্রন্থে কামের প্রসঙ্গই নেই। কেবল আছে দাসীর কামহীন পরিচারিকাবৃত্তির বিশদ বিবরণ। সেখানে প্রভু ধর্ম মান্য করে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সমানভাবে রাত্রিযাপন করে 'অহিংসা মূলে' জীবন কাটিয়ে যায়। নজিবর রহমান রটনা করেন যে শরীর দিয়ে প্রভুকে বেশিক্ষণ তুষ্ট রাখার যায় না, তাকে তুষ্ট রাখার জন্যে প্রয়োজন বিবির মহাবাঁদী হয়ে ওঠা। আকিকুন্নেসা রটনা করেন বাঁদী হয়ে প্রভুকে তুষ্ট করা যায় না, প্রভুকে তুষ্ট করার একমাত্র পথ হচ্ছে শরীরের রসলীলা। তাই সংসারের সমস্ত কাজকর্ম করে শাশুড়ির 'ভালো বৌ' না হয়ে নারীকে 'স্বামীর স্ত্রী' হতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন তিনি।

আকিকুন্নেসা এ-ফুসলানি যাদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেন তারা চল্লিশের দশকের বাঙালি মুসলমান নারী। এরা দেখা দেয় কলকাতবাসী সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে। ওই পরিবারগুলোতে এ-সময় মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার রেওয়াজ চালু হয়ে ওঠে। সাধারণ নাগরিক সমাজে নানারকম ডিগ্রি পাওয়া নারীকুলের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এদের বড়ো অংশই হাউজ ওয়াইফ থেকে জীবন সার্থক করে, তবে কেউ চাকুরিও করা শুরু করে। তবে চাকুরি করার দিকে তারা প্রাণের আনন্দে ছুটে যায় না, ওই পথে যেতে বাধ্য হয় 'কপালের দোষে।' ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনকারী পিতা বা পতিপ্রভুর মৃত্যুই তাদের কাউকে কাউকে চাকুরি করতে বাধ্য করে।

নারীর এই লেখাপড়া শেখাটা এ-সময় সমাজ মেনে নেয় ঠিকই, তবে তা মেনে নেয় খুবই বিমুখ চিত্তে। এ-সময় বঙ্গীয় মুসলমান প্রভুরা নারীকে সামান্য লেখাপড়া শিখতে দেয় পুরুষের জন্যেই। তবে একই সঙ্গে লেখাপড়া জানা নারীদের বিরুদ্ধে রটায় নানা কুৎসা। ওই সময় পুরুষতন্ত্র প্রচারণা চালাতে থাকে যে লেখাপড়া জানা নারী কোনো অবস্থাতেই 'ভালো বউ' হতে পারে না। রটনা করা হতে থাকে যে লেখাপড়া জানা মেয়ের 'চোখ ফুটে' যায় বলেই তার মধ্যে 'আদব লেহাজ' থাকে না, এমনকী গোপনে ব্যভিচারও করে বলে রটনা করা হয়। এই রটনার পেছনে কাজ করেছে ওই 'শিক্ষাপ্রাপ্ত' নারীদের পুরুষতন্ত্রের 'সাইজ মতো' করে রাখার অভিসন্ধি।

ওই সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তদের 'আধুনিকা' আখ্যা দেয়া হয় নিন্দার্থে। তাদের লেখাপড়া শেখাটাই তাদের অপরাধ। যদিও তাদের অভিভাবক প্রভুরা তা শিখতে পাঠায় পতিপ্রভুর দাবি পূরণের জন্যে; কিন্তু পুরুষতন্ত্র অপরাধী বলে প্রতিপন্ন করে

নারীকেই। এভাবে পুরুষতন্ত্র ওইটুকু ছাড় দেবার ঝাল মেটায়। এই 'আধুনিকাদের' বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে 'আধুনিকা তরুণীরা আদর্শ স্ত্রী হইতে পারেন না'। ওই আধুনিকারা 'দাম্পত্য জীবনের নামে আঁৎকিয়ে উঠিতেছি' আর গোপনে চালিয়ে যাচ্ছে ব্যভিচার। কারণ :

> কারণ যৌন ক্ষুধা পেটের ক্ষুধার মতই তীব্র। সে ক্ষুধা না মিটাইয়া উপায় নাই। অথচ যৌন ক্ষুধা মিটাইবার সহজ সরল ধর্ম্মসম্মত বিবাহ জীবনকে অংকিত করা হইতেছে ভয়াবহ চিত্তে। এর ফলেই তরুণীরা বিবাহোত্তর জীবনে যৌন ক্ষুধা মিটাইবার দিকে প্রলুব্ধ হইতেছে।

আকিকুন্নেসা আধুনিকাদের ব্যভিচারপ্রবণ বলেছেন, তবে তাদের ব্যভিচারী হয়ে ওঠার জন্যে দায়ী করেছেন নির্বোধ অভিভাবককে। তবে নারীর প্রতি এমন মনোভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের ঘৃণা ও অবিশ্বাস। সহজাতভাবে সংযত ও কাম নিয়ন্ত্রণে সক্ষম নারীর বিরুদ্ধে এমন কলঙ্ক রটনা এই প্রথম নয়। এটি পুরুষতন্ত্র করে এসেছে পেছনের সহস্র সহস্র বছর ধরে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে নারীর শৃঙ্খল অটুট রাখার জন্যে পুরুষতন্ত্র নতুন করে প্রয়োগ করেছে ওই পুরোনো কৌশল।

আকিকুন্নেসা আধুনিকা স্ত্রীদের কামবিনোদিনী হতে নির্দেশ দেন পতিপ্রভুকে পতিতাগমন থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে। তিনি নারীকে শেখাতে চান প্রভুর দেহ তৃপ্তির ও মনতুষ্টির ছলাকলা; যে ছলাকলা পণ্যনারী জানে বলে সকল পুরুষ তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চান, ওই কামকলা ঘরে ঘরে সকল নারীকে শেখাতে তৎপর হন তিনি। বিবি পতিতার মতো কলানিপুণা হবে; কিন্তু নানা কলায় পতিতার দক্ষতা অর্জন করে সারাজীবন ধরে থাকবে পতিনিষ্ঠ। প্রতিঘরের বিবিরা কামকলা নিপুণা নয় বলে আকিকুন্নেসা আফশোসে ভেঙে পড়েন :

> অনেক স্ত্রী নিজেদের দাম্পত্য জীবন বিষময় করিতেছে। তারা নিজের ধন অবহেলায় বেশ্যা বাইজীর হাতে তুলিয়া দিতেছে। অনেক স্বামীই ঘরে সুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত কমসুন্দরী বাজারের মেয়ের পেছনে যাইতেছে। কেন ? তার কারণ এই যে, যৌন ক্রিয়াকে বাজারের মেয়েরা ক্রীড়ারূপে, আর্টরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। ঐ কলাকৌশলে তারা আমাদের ঘরের পুরুষকে টানিয়া বাহির করিয়া নিতেছে।... আর আমরা সতী সাধ্বী স্ত্রীরা ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতেছি। পায়ে ধরিয়া স্বামীকে ফিরাইতে গিয়া তার লাথি খাইতেছি।

তাই আকিকুন্নেসা তাঁর চারপাশের শিক্ষিত নারীকুলকে 'বাড়ির সকলের ভাল বউ' না হয়ে 'স্বামীকে যৌন তৃপ্তির রসে ডুবাইয়া' রাখার কেরামতি জানা

কামবিনোদিনী হতে বলেন। ওই কামবিনোদিনীর জীবন শুধু পতিপ্রভুকে তৃপ্ত করার জন্যে। শুধু শরীর দিয়ে তৃপ্ত করাই হচ্ছে প্রভুকে সবচেয়ে বেশি সেবা করার একমাত্র পথ। আকিকুন্নেসা দেন পতিব্রতার নতুন সংজ্ঞা। যে পরিচারিকা শরীরের নানা কেরামতি দিয়ে প্রভুকে 'সাধ্যমতো তৃপ্তি' দিতে পারে সেই প্রকৃত পতিব্রতা। আকিকুন্নেসার বিধিবিধান পাঠের জানা যায় মানব জীবনের সারকথা হচ্ছে কাম। নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রভুকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যৌনতৃপ্তি দিয়ে যাওয়া। নারীকে হতে হবে 'স্বামীর স্ত্রী' মাত্র, কখনোই 'শাশুড়ির বউ' নয়, বা সন্তানের মা- ও নয়। আর তার জানতে হবে একটি মাত্র তেলেসমাত। নারী 'মরাগাছে ফুল' ফোটাবে ওই তেলেসমাত দ্বারা। 'শিকল ছেঁড়া যণ্ডা প্রকৃতির স্বামীকে বশে' আনবে ওই তেলেসমাত দিয়ে। প্রভুর ক্রোধ নিবৃত্ত করবে ওই তেলেসমাতের জোরে, প্রভুর তালাক দেয়া রোধ করবে ওই তেলেসমাতের ইন্দ্রজালে :

> সে তেলেসমাতটি হইতেছে যৌন উপগমন। যত রাগই স্বামীর হইয়া থাকুক না কেন, এমন কি সকালে উঠিয়াই তোমাকে তালাক দিবে বলিয়া যতই কিরা-করুক করিয়া থাকুক না কেন, যদি রাতে বিছানায় ফন্দি ফিকিরি করিয়া তাকে ও- কাজে রুজু করিতে পারে এবং তাতে তোমার সাধ্যমত তৃপ্তি তাকে দিতে পার, তবে দেখিবে স্বামী একেবারে কাদা হইয়া গিয়াছে। আগের দিনের রাগারাগি নূতন প্রেমের রূপান্তরিত হইয়াছে। আগের দিনের ঝড় তুফান ও মেঘগর্জন কাটিয়া গিয়া উজ্জ্বল প্রভাতে রঙিন সূর্য উদিত হইয়াছে।

আকিকুন্নেসার পৃথিবীতে হৃদয়াবেগের মূল্য নেই। মূল্য আছে নারীর শরীরের, যে শরীরধারী যত বেশি কামকলা নিপুণা, সে-ই ততোবেশি 'স্বামীর স্ত্রী' হবার যোগ্যতাসম্পন্ন। এই রসদেবীর জানা থাকতে হবে এমন কামমন্ত্র যা দিয়ে সে পতির নিদ্রিত পৌরুষকে জাগিয়ে তুলবে। কাম কৌশলই তার পরম ধন তার 'সোনার কাঠি'। তার জানা থাকতে হবে বশীকরণ মন্ত্র আর সে নিজেই হবে 'পরশ পাথর'। প্রভুর দেহ পরিতৃপ্ত করবে প্রভুর মর্জিমতো, একই সঙ্গে তাকে জানতে হবে 'স্বামীর মন শেষ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখা'র কৌশল। প্রভুকে 'আসুদা' করার সঙ্গে সঙ্গে 'নিজেকে সস্তা' না করার কৌশল জানতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে তাকে। তবেই সে হতে পারে 'উস্তাদ নারী'। তবে সব সময়ই নারীকে মনে রাখতে হবে এ কথা যে-

> পুরুষকে বাঁধিয়া রাখার উপায় পায়ে ধরাও নয়, চোখের পানিও নয়। নীরব স্বামীভক্তি দিয়া স্বামীর মন পাওয়া যায় না। পুরুষ বাঁধিবার সবচেয়ে শক্ত শিকল তার যৌন তৃপ্তি। প্রেম ফুল। সে ফুল শুকাইবেই যদি না তাতে দৈনিক পানি সিঞ্চন কর। যৌন তৃপ্তিই সেই পানি যাতে

> প্রেমের ফুল সদা তাজা থাকে। বরঞ্চ সে পানি এমনি আবেহায়াত যে তাতে মরাগাছেও লতাপাতা ও ফুলফল ধরিতে পারে।

এ কাজে সদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে লীলাবতী রসময়ী বাঁদীকেই। শুধু দেহবিভঙ্গে মদালস করে ক্ষান্ত হলেই চলবে না। তাকে প্রভুর গলা জড়িয়ে সুমধুর বচনে জানাতে হবে তার প্রতি ভালোবাসা বোধ করার কথা। নারীকে উচ্চকণ্ঠে জানাতে হবে তার অন্তরের অনুরাগ। নিজের দেহ যেমন সে নিজে খুলে ধরবে, তেমনি খুলে দেবে নিজেই নিজের হৃদয়। কারণ, বিনোদন সামগ্রীর আগপাশতলার দিকে তাকাবার অবকাশ ও সময় নেই প্রভু শক্তিমানের। 'দুনিয়ার ধান্ধায় ব্যস্ত পুরুষের পক্ষে সার্চলাইট ফেলিয়া স্ত্রীর অন্তরতলে গোপন প্রেম আবিষ্কার করিবার অবকাশ কোথায়?' যেহেতু পতিপ্রভুর অবকাশ নেই সেহেতু বাঁদীকেই তৈরি করতে হবে পরিস্থিতি। জানাতে হবে মনের নিষ্ঠা ও প্রেমের কথা। যদি কেউ তা জানাতে কুণ্ঠিত হয় বা ব্যর্থ হয় তবে তার ভাগ্যে শোচনীয় পরিণাম ঘটবে বলে হুঁশিয়ারী সংকেত দেন এ-কামসূত্র প্রণেতা। প্রয়োজন হলে 'ভণ্ডামি করিয়াও ভালবাসা দেখাইতে হইবে।' কেন না এইই নারী জীবনের উদ্দেশ্য। প্রভুর জন্যে দেহ ধারণ করা, প্রভুর জন্যে নিজেকে সারারাত ধরে উজাড় করে দেয়াই নারীজীবন।

> প্রাণী জগতের জন্যে বৃক্ষলতার কাজ যা, পুরুষের জন্যে নারীর কাজও ঠিক তাই। পুরুষ সারাদিন বাহিরে কঠোর কর্তব্যের শ্বাস প্রশ্বাসে প্রেম ভালবাসা ও সুখ- শান্তির সবটুকু অক্সিজেন ক্ষয় করিয়া মগজে শুধু নাইট্রোজেন লইয়া দিবাশেষে ঘরে ফিরিয়া আসে। সারারাত্র নারী তার প্রেম কোমলতা দিয়া পুরুষের মস্তকের সেই নাইট্রোজেন দূর করিয়া সে স্থলে অক্সিজেন ভরিয়া দেয়। এটাই নারী-পুরুষের সম্পর্ক।

এ-সম্পর্ক মজবুত রাখতে পারে শুধুমাত্র নারী। এ-সম্পর্কে মজবুত রাখার জন্যে নারীকে সব সময় তার দেহ মেজে ঘষে রাখতে হবে। কেন না নারীর শরীরই তার একমাত্র মূলধন। ওই মূলধন তাকে রক্ষা করতে হবে সযতনে। তাই 'স্বামীর সন্তোষ বিধানের জন্য তথা দাম্পত্য জীবন সুখময় করিবার জন্যে প্রত্যেক নারীর রূপচর্চা করা অবশ্য কর্তব্য।' নারীকে অঙ্গের সকল অংশের প্রতি যত্নশীল হতে বলেন আকিকুন্নেসা, তবে সবচেয়ে বেশি যত্নশীল হতে নির্দেশ দেন একটি বিশেষ প্রতঙ্গের প্রতি। *'স্তনই নারী সৌন্দর্যের পিরামিড।* 'নারীদেহের সৌন্দর্যের দিকে দিয়া' যেমন 'এই স্তনে স্থান সর্বোচ্চ', তেমনি 'যৌনজীবনে পুরুষের তৃপ্তির দিক দিয়া নারীর স্তনের স্থান সর্বোচ্চ'। যেহেতু প্রভুকে পরিতৃপ্ত করার জন্যেই নারীর জীবন ও নারীর শরীর, তাই নারীকে এ- অংশের প্রভূত যত্ন নেয়ার নির্দেশ দেন আকিকুন্নেসা। একই সঙ্গে তিনি নারীকে বাতলে দেন প্রভুর চিত্তজয়ের সহজ পন্থা :

যে নারীর উন্নত স্তনের সূচাগ্র বোঁটা পুরুষের চোখে বিঁধিয়া পড়িল, সে নারী পুরুষের মন পনের আনা জয় করিয়া ফেলিল।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন হলে 'ভণ্ডামি' করার বিধান দেন এই নব্য কামসূত্র রচয়িতা, তেমনি পতিপ্রভুর চিত্ত প্রসন্ন রাখার জন্যে দরকার মতো সকল বিষয়ে 'ভণ্ডামি' করার জন্যে নারীকে পরামর্শ দেন তিনি। কোন বিষয়ে কিভাবে ছলাকলা দেখাতে হবে ও ছলচাতুরি করতে হবে সে বিষয়ে তিনি দেন বিশদ মন্ত্রণা। প্রৌঢ় নারীকেও প্রভুর চোখ পরিতৃপ্ত করার কৌশল শেখান তিনি :

স্বাভাবিক কারণেই একদিন স্তন নরম হইয়া হেলিয়া পড়িবেই। সে অবস্থায় চিৎ হইয়া শুইলে স্তন খাড়া ও সুন্দর দেখাইবে। কিন্তু বসা চলাফেরা অবস্থায় স্তন ঝুলিয়া থাকিবে। ... স্তনের এই অবস্থা হওয়ার পরও কৃত্রিম উপায়ে ইহাকে উন্নত ও পুষ্ট দেখাইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এমন মনে করা কখনো উচিৎ নয় যে স্বামী তো আমার স্তনের প্রকৃত অবস্থা জানেই, কাজেই বডিস লাগাইয়া ফাঁকি দিব কাকে? এটা নিতান্ত ভ্রান্ত যুক্তি, প্রথমত : স্বামী এক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া প্রতারিত হইতে ইচ্ছুক আছে। হাতে যেমনই লাগুক, তার চোখে যদি উহাকে সুন্দর দেখাতেই পার তাতেই স্বামী সন্তুষ্ট হইবে। ... বডিসে বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া স্তনকে সুন্দর ও উন্নত করিয়া স্বামীকে দেখাইয়া ফিরিলে সে সন্তুষ্ট হইবে, তোমার প্রতি তার আকর্ষণ অক্ষুণ্ন থাকিবে।...কোন স্বামীই চায় না যে তার স্ত্রীর বুক পড়িয়া গিয়াছে এটা অন্য লোক জানুক বা দেখুক। বরঞ্চ নিজের স্ত্রীর স্তন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নজরে পড়িতেছে জানিয়া প্রত্যেক স্বামীই গৌরব বোধ করিয়া থাকে।

এ- গ্রন্থে নারীর জন্যে প্রণয়ন করা হয় আরো বহু বিধিসূত্র, যা পালন করার মধ্য দিয়ে ঘরের পত্নী হতে সমর্থ হবে 'বাজারের মেয়েলোকের' মতো নানা কলানিপুণা। নিচে কিছু বিধি উদ্ধৃত করা গেলো :

ক. এক বিছানায় শুইও, কদাচ পৃথক বিছানা করিও না।

খ. কোন অবস্থাতেই স্বামীর বিছানা ছাড়িও না।

গ. তোমার স্বামীর প্রয়োজনই সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন।

ঘ. স্বামীর যৌনতৃপ্তি একটা তেলেসমাত; তার রাগ থামাইবার জন্যে এই তেলেসমাত ব্যবহার করিতে ভুলিও না।

ঙ. বুদ্ধিমান স্ত্রীরা স্বামীর নারীঘটিত দুর্বলতা হইতে চোখ ফিরাইয়া রাখেন। গোপনে স্বামীর গতিবিধির খবর নেওয়ায় আপত্তি নাই। কিন্তু স্ত্রী তার এফেয়ার্স জানিয়া ফেলিয়াছে একথা কখনো স্বামীকে জানিতে দিতে নাই।

চ. জীবিকার্জনের জন্যে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে বাড়ি

ফিরিয়া স্বামী তার ক্লান্তি দূর করিতে চায় স্ত্রীর সৌন্দর্যের ঠাণ্ডামিঠা শরবৎ পান করিয়া। যে স্ত্রী ক্ষুধার্ত স্বামীর এই ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটাইতে পারিল না, বা সে কাজে অবহেলা করিল, তার কপাল যদি ভাঙ্গে তবে সেজন্যে অদৃষ্টকে দোষ দেওয়া সাজে না।

ছ. স্বামীকে ঘরে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রাখার বড় উপায় রতি রঙ্গে তাকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রাখা। রতি রঙ্গে তাকে তৃপ্ত রাখা মানে তার প্রয়োজন মতো পরিমাণে সুখ দেওয়া। স্বামী রতি শক্তিতে দুই প্রকারের এক প্রকার হইতে পারে। হয় সে খুব সরল নয়তো দুর্বল। সবল স্বামীর স্ত্রীরা যদি স্বামীর রতি ক্রিয়ায় বাধা দেয় অথবা আহা উহু করিয়া যন্ত্রণা জানায় তবে হৃদয়বান স্বামীরা স্ত্রীর খাতিরে কঠোরভাবে আত্মদমন করে। তাতে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, মন মেজাজ খারাপ হয়, কর্মশক্তি ও উৎসাহ লোপ পায়। সংসারে আগুনে লাগে।

জ. স্বামী রতি শক্তিতে খুব দুর্বল হইতে পারে, রতি ক্রিয়ায় স্ত্রীকে পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে সে অক্ষম হইতে পারে। এমন স্বামীর স্ত্রীকেও স্বামীর শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। স্ত্রী তৃপ্তি পাইতেছে না এটা স্বামীকে কখনও কিছুতেই জানিতে দিবে না। বরঞ্চ মিথ্যা করিয়া বলিবে, সে খুব তৃপ্তি পায়, স্বামী যথেষ্ট শক্তিশালী। তা যদি না করে, স্বামীর অক্ষমতার জন্যে স্ত্রী যদি অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি প্রকাশ করে, তবে ... স্বামী আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। ... ক্রমে একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি ভণ্ডামি করিয়াও নিজের তৃপ্তি জানায় এবং মিথ্যা করিয়া স্বামীর শক্তির তারিফ করে, তবে স্বামীর মনে আত্মবিশ্বাস জন্মিবে। তাতে পরিণামে স্বামীর দুর্বলতা দূর হইবে।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান যেমন নারীকে বিশেষ ছাঁচে গড়ে তোলার মহা অভিসন্ধি দিয়ে চালিত হয়েছিলেন, তেমনি আকিকুন্নেসাও চালিত হয়েছেন একই অভিসন্ধি দ্বারা। নজিবর রহমান দাসী হতে বলে আর আকিকুন্নেসা হতে বলেন কামভাণ্ড। যে কামভাণ্ড ব্যবহৃত হবে পুরুষের প্রয়োজনে; কিন্তু কখনো কোনো অবস্থাতেই নিজের কথা ভাববে না। এ-কামভাণ্ড দিয়ে পুরুষ একই সঙ্গে নিবৃত্ত করবে দুই চাহিদা, রাতে মেটাবে কামক্ষুধা, দিনে ব্যবহার করবে দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজে। আকিকুন্নেসার পৃথিবী কামময়। নারী সেখানে সুকোমল, নানারকম উত্তেজক স্ফীতিতে পরিপূর্ণ কামনিবৃত্তির মাংসপিণ্ড। আকিকুন্নেসা নারীকে পতিতা হতে প্ররোচনা দেন, হতে বলেন গৃহস্থ পতিতা। যে কলাবতী কামবিনোদিনী নিষিদ্ধ পল্লীতে বাস করে বলে শোনা যায়, প্রভু তাকে পেতে চায় প্রাত্যহিত শয্যায়। ওই কলাবতী পতিতার ছাঁচ তৈরি করা হয়েছে এ- গ্রন্থে। এমন নানাবিধ ছাঁচের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বাঙালি মুসলমান নারী অবশেষে এখন পৌঁছেছে ভয়াবহ এক কিম্ভূত কাঠামোতে।